মাটির বারতা

(প্রথম খণ্ড)

স্নেহময় ব্রহ্মচারী প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ)

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নিবেদন

বাংলা ১৩৪৮ এর ২৮শে অগ্রহায়ণ হইতে ২২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সাত দিন কম তিন মাস কাল পূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে যে বিশ্রামহীন ভ্রমণ ও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, আচার্য্যপাদের চরণ-সেবা-প্রসঙ্গে সেই সময়ে তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া সেই সময়কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্কলন রাখিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীবাবার স্বহস্ত-গঠিতা মানস-কন্যা, রমণীকুলের শিরোমণি, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারিকা ও শক্তিশালিনী বাগ্মিনী পরমপূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবীও এই ভ্রমণে শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার বিপুল শ্রমের অনুপূরণ করেন। কোথাও পরম পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী শ্রীশ্রীবাবার সহিত একই বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিয়াছেন, কখনও কখনও শ্রীশ্রীবাবা যে সময়ে এক গ্রামে বক্তৃতা দিতেছেন, ঠিক্ সেই সময়ে তিনি এমন এক গ্রামান্তরে গিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, যেখানে ঠিক্ একটা দিন পরে শ্রীশ্রীবাবা গিয়া উপস্থিত হইবেন। অল্প-সময়-মধ্যে অধিক কাজ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। কোথাও কোথাও শ্রীশ্রীবাবা যে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীকে সেই গ্রামেও বক্তৃতা দিতে হইয়াছে এবং তিনি শ্রীশ্রীবাবার সহিত পরবর্ত্তী আর এক গ্রামে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে পরম-পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী শ্রীরামপুর (হুগলী), সলিয়া (নোয়াখালী) প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে একাকিনী গিয়া বিশাল ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ভিতরে গুরুকৃপাসঞ্জাত

দেবী প্রতিভা যে অত্যাশ্চর্য্য বাগ্‌বিভূতির মধ্য দিয়া এবার প্রকাশ পাইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন ও অপ্রত্যাশিত। ১৩৪৭ এর ৬ই মাঘ তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায় রহিমপুর আশ্রমে যে অখণ্ড-সম্মেলন হইয়াছিল, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী মহোদয়া তাহাতে অতীব যোগ্যতার সহিত সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত মৌখিক অভিভাষণ সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরদিবস রহিমপুরের চিরস্মরণীয় বিরাট উৎসবের সভায় সমাগত ত্রিশ সহস্র নরনারীর সমক্ষে তিনি যে মুদ্রিত অভ্যর্থনা-ভাষণ মাইক্রোফোন যোগে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাও জন-সমাজে তাঁহার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, ইনি উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা। কিন্তু ১৩৪৮ এর শীতের এই ত্রিপুরা-ভ্রমণে পূজনীয়া সাধনা দেবীর বক্তৃতা সমূহ তাঁহার পূর্ব্ব যশকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা সমূহেরও কিছু কিছু সঙ্কলন আমি রাখিয়াছিলাম কিম্বা আমার অপর সতীর্থগণ রাখিয়াছিলেন। তাহাই একত্র করিয়া এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। প্রথমে কল্পনা ছিল যে, গ্রন্থের নাম রাখিব "শীতের ত্রিপুরা" কিন্তু শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী ত্রিপুরায় ঘুরিয়া উপদেশ দিলেও, এ উপদেশ সমগ্র পৃথিবীর জন্য এবং এ উপদেশ পালন করিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্য গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি "শান্তির বারতা"।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যে সময়ে প্রেসে পাঠাইবার জন্য লিখিত হইতেছে, সেই সময়ে শঙ্কা-সঙ্কট-ব্যাকুল বিপুল হিন্দু-সমাজের অন্তরের ভয় বিদূরণের ব্রত লইয়া শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব এবং শ্রীযুক্তা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী নানা বিপর্য্যয়কর ও বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে বাংলা এবং

নিবেদন

আসামের নানাস্থানে অভয়বাণী ছড়াইতেছেন। মৃতপ্রায় নবজীবন পাইতেছে, মুমূর্ষু শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন চির-অলস তন্দ্রা, আলস্য, অবশতা ও ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া কাজে লাগিতেছে। যদি মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ সুযোগ প্রদান করেন, তবে সেই বাণীগুলিও সঙ্কলন করিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি।

এই গ্রন্থে যাঁহাদের শান্তিময়ী বাণী সঙ্কলিত হইল, তাঁহাদের প্রীত্যর্থে ইহার স্বত্ব, স্বামিত্ব ও সর্ব্বাধিকার উভয়ের প্রতি অকপট-ভক্তি সহ অযাচক আশ্রম অ্যাণ্ড স্বরূপানন্দ ফিলান্থ্রপিক ট্রাষ্টকে অর্পণ করিলাম। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও অধিকার বা দাবী রহিল না। আমার পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কিত কোনও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরও না।

যে সময়কার উপদেশ, বক্তৃতা ও ঘটনাবলি "শান্তির বারতা" গ্রন্থে প্রকাশিত হইল, সেই সময়কার আরও বিবরণ বা উপদেশ যদি অন্যান্য সূত্র হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করিব।

আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতার দোষে জীবহিতপরায়ণ মহাপুরুষগণের বাণী যেখানে বিকৃত হইয়াছে, সেখানে এই বিকৃতীকরণের দোষ সম্পূর্ণই আমার। তবে, চেষ্টা করিয়াছি যেন, আমার নিজের রচিত কথা তাঁহাদের শ্রীমুখে বসাইয়া দেওয়া না হয়। এই বিষয়ে আমার যত্ন অকপট। ইতি

বারাণসী, বিনীত

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫৪। শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী

শান্তির বারতা

সূচনা

পরমপূজ্যপাদ অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের বিগত ১৩৪৮ বাংলা সনের শীতকালের ত্রিপুরা ভ্রমণের বৃত্তান্ত আমাদের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব্ব, অভাবনীয় ব্যাপারের কি যে বিবরণী লিখিব, তাহা আমার কল্পনার অতীত। এমন দৃশ্যাবলী দেখিয়াছি, যাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। শ্যাম-সুন্দরের মুরলী-ধ্বনি শুনিলে দ্বাপরে যমুনা নাকি উজান বহিত। শ্রীশ্রীবাবার প্রেমময়-কণ্ঠের মধুমাখা ধর্ম্মকথা কলিযুগে মরাগাঙ্গে বান বহাইয়াছে। দিকে দিকে হরি-ওঁ-কীর্ত্তনের প্রেমোজ্জ্বল মঙ্গল-ধ্বনি আকাশ, বাতাস, ভূতল, পাতাল মন্দ্রিত, ঝঙ্কৃত, প্রতিধ্বনিত ও মুখরিত করিয়াছে। কত নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, কত অবিশ্বাসী ভগবদ্বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে, কত অভক্ত ভক্তিরসে আপ্লুত-হৃদয় হইয়া প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়াছে, ডুবিয়াছে, আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। অশান্তির চির-অন্ধকারময় গৃহপ্রাঙ্গণে নিমেষের মধ্যে সুখসূর্য্যের উদয় হইয়াছে, গৃহস্থের নিত্য-দুঃখাচ্ছন্ন জীবন পরমানন্দের সুখাবেশে উজ্জ্বল ও মধুর হইয়াছে। চিরদুর্ব্বলের অন্তরে আধ্যাত্মিক বলের প্রাচুর্য্য জাগিয়া উঠিয়াছে, নিত্যসংশয়াচ্ছন্ন নর-নারী বিগত-সংশয় হইয়া নিমেষের মধ্যে লক্ষ যুগের জড়তা, আলস্য ও অবসাদ পরিহার করিয়াছে, সদা-সমস্যাকুল

সৎসঙ্কল্পবর্জ্জিত মতিস্থিরতাহীন অসুস্থ মানব-মানবী নিমেষে নিজের জীবন-পথের নির্ভুল নির্দ্দেশ লাভ করিয়াছে, সংসার-দাব-দগ্ধ জ্বালা ভুলিয়াছে, নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইয়াছে, ব্রতচ্যুত, পথভ্রষ্ট, দিগ-নির্ণয়ে অক্ষম, কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অসমর্থ সহস্র সহস্র নরনারী জীবনের প্রকৃত ও সত্যপথে অগ্রসর হইবার অভ্রান্ত প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছে। শিশু গাহিয়াছে "হরি ওঁ", যুবক গাহিয়াছে "হরি ওঁ", বৃদ্ধ গাহিয়াছে "হরি ওঁ", নারী গাহিয়াছে "হরি ওঁ",—শত কণ্ঠে, সহস্র কণ্ঠে উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রাণ-মনো-মাতোয়ারা অতীব মধুর কণ্ঠে অতীব মধুর সুরে কেবলই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে "হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।" ওঙ্কারই যে সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার, ওঙ্কারই যে সর্ব্বধ্বনির সমন্বয়, ওঙ্কারই যে সর্ব্বতন্ত্রের প্রাণ, ওঙ্কারই যে সর্ব্বমতের স্বীকৃতি, ওঙ্কারই যে সর্ব্বপথের মিলন-স্থান, কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে অহরহঃ এবং অবিরাম পথে ও প্রান্তরে, গৃহে ও অঙ্গনে, মন্দিরে ও মণ্ডপে, শিবিরে ও বিশ্রামাগারে ইহাই শব্দে, কণ্ঠে, সুরে, মনে, প্রাণে এবং আত্মায় অনুশীলিত, অনুধাবিত ও পরিশীলিত হইয়াছে। যে ভাগ্যহীন কণ্ঠসম্পদে বঞ্চিত, সে মন প্রাণ দিয়া শুনিয়াছে, প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে।

কি যে দেখিয়াছি আর কি যে শুনিয়াছি, বলিবার ভাষা বা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। তথাপি বলিতে বসিয়াছি। কারণ, বলিতে আনন্দ পাই।

প্রস্তাবিত শারদীয় ভ্রমণ

বিগত ১৩৪৭এর ৭ই মাঘ তারিখে ত্রিপুরা জিলান্তর্গত রহিমপুর আশ্রমে যে চিরস্মরণীয় ধর্ম্ম-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে,* তাহাতে যদিও প্রায় ত্রিশ

* উক্ত সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ আমি পৃথক্ গ্রন্থে শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি।

পঁয়ত্রিশ হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল, তথাপি শত শত নরনারীর প্রাণের আকুল আবেগ সত্ত্বেও শ্রীপাদ অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হন নাই। মানুষের মাথা মানুষে খাইতেছিল। অনেকে রহিমপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনের জন্য আসিতে না পারিয়া কত আক্ষেপপূর্ণ পত্র লিখিয়া মনের ব্যথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীশ্রীবাবা ভক্তজনের প্রাণের কামনা পূরণের জন্য স্থির করিলেন যে, ভাদ্র-আশ্বিন দুইমাস জুড়িয়া ত্রিপুরার পল্লীতে পল্লীতে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিবেন। যথাকালে ভ্রমণ-তালিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। সহস্র সহস্র নরনারী তাহাদের ধ্যানের দেবতা, প্রাণের ধন শ্রীশ্রীবাবার আগমন-আশে পথপানে চাহিয়া আশায় আশায় দিন গণিতে লাগিল।

মানভূমের দুর্ভিক্ষ

কিন্তু এই সময়ে মানভূম জেলায় এক বিষম দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গেল। অমনিই এই জেলার লোকেরা বৎসরে তিন চারি মাস শুধু মহুয়া ফুল খাইয়া প্রাণধারণ করে। এই জেলার লোকের আর্থিক দুরবস্থা বিদূরণের জন্য নানাবিধ উপায়ের অনুশীলনে শ্রীশ্রীবাবা বাংলা ১৩৩৪ সাল হইতে সুরু করিয়া এই চৌদ্দ বৎসর কঠোর শ্রম স্বীকার ও অতুলনীয় কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন। মানভূম-বাসী সাধারণেরা শ্রীশ্রীবাবার এই অতুলনীয় শ্রমের মর্য্যাদা ও মূল্য কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, যে যাহাকে সেবা দেয়, সে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ভাল না বাসিয়াও পারে না। অথবা সত্য করিয়া বলিতে গেলে, প্রাণের অফুরন্ত প্রেম ছাড়া সেবা কখনও সেবাপদবাচ্য হয় না। শ্রীশ্রীবাবা এতকাল মানভূমবাসীকে যে সেবা দিয়া

আসিতেছেন, তাহা পরমপ্রেম সহকারেই দিয়া আসিতেছেন। আজ মানভূম-বাসীর দারুণ বিপদে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইল। মানভূম-বাসীরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মন্ত্রীদের নিকটে দরবার করিতে লাগিল, কিন্তু ফলোদয় হইল না। চাশ ও চন্দনকিয়ারী থানাতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা অতি গুরুতর আকার ধারণ করিল। আমাদের অন্যতম গুরুভ্রাতা মানভূম জেলা-বোর্ডের মেম্বার শ্রীযুক্ত হরদয়াল শর্ম্মা এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। যে মানভূমে শ্রীশ্রীবাবা জনসেবার মানসে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাপন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে, সেই মানভূমের এই বিপদে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র জন-সাধারণকে কর্ম্ম দিয়া অন্ন দিয়া বাঁচাইবার জন্য যে মহাযজ্ঞ তিনি সুরু করিলেন, তাহা ফেলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া আসিলে বহু দরিদ্রের অনশন-ক্লেশ হইবে বলিয়া তিনি শারদীয় ভ্রমণ বাতিল করিলেন।

দুর্ভিক্ষ দমনের পন্থা ও প্রণালী

কেহ কেহ বলিলেন,—দুর্ভিক্ষ দমনার্থে অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্য আশ্রম হইতে চতুর্দ্দিকে আবেদন-পত্র সমূহ প্রচারিত হউক এবং মান-ভূমেরই সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা হউক। কিন্তু অযাচক-বৃত্তিতে আঘাত পড়িবে বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তবে, এই জাতীয় চেষ্টা যাঁহারা পরিচালন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মানভূম-জেলা কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা নিজস্ব ভঙ্গিমায় একটী অপূর্ব্ব পন্থার আশ্রয় লইলেন। তিনি মানভূমের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া গরীবদিগকে কাজ দিয়া

বাঁচাইবার জন্য অবস্থাপন্ন লোকদিগকে প্রেরণা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে সভানুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রত্যেক সভায় তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যাহারা অন্নহীন হও নাই, বস্ত্রহীন হও নাই, দুর্ভিক্ষের নিদারুণ প্রকোপ যাহাদের এখনও উপবাস করিতে বাধ্য করে নাই, তাহারা এখনি নিজ নিজ টাঁড় জমি কাটিয়া ধান্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার কাজে বিপন্ন দরিদ্র লোকদিগকে লাগাও।" পদ-ব্রজে গ্রামের পর গ্রাম ভ্রমণ করিয়া তিনি বক্তৃতা দিতে লাগিলেন,—"প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা সঙ্কল্প কর যে, এই গ্রামের লোককে আমরা ভিক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইতে দিব না এবং হয় বাঁধ কাটিয়া, নয় ধান্য-ক্ষেত্র তৈরী করিয়া, নয় ইন্দারা খুড়িয়া সমস্ত লোকগুলিকে পেটে-ভাতে হইলেও বাঁচাইয়া রাখিবার পণ করিলাম।" যাহারা তেমন বিত্তশালী নহে, পরন্তু শ্রীশ্রীবাবার প্রেমপূর্ণ ভাষণে যাহাদের চিত্ত পরদুঃখে বিগলিত হইয়াছে, তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—"এই কার্য্যে তুমি এক শত টাকা ব্যয় করিতে না পার, দশ টাকাও ত' ব্যয় করিতে পারিবে! চতুর্দ্দিকের বিভিন্ন গ্রামের একশত জন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি এ ভাবে দশটী করিয়া টাকার কাজ করাইলে ছয় হাজার নিরন্ন লোকের একদিনের আহারীয় * সংস্থান হইতে পারে। নিঃস্বার্থ হইয়া ছয় হাজার লোককে একটা বেলা খাওয়াইবার রুচি বা এ কার্য্য সম্পাদনের সঙ্ঘশক্তি হয়ত তোমাদের একদিনে হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ধান্য ক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধির জন্য টাঁড় কাটিবার কাজে নিজের

---

* এই সময়ে মানভূমের দিন-মজুরের দৈনিক পারিশ্রমিকের হার দুই আনা হইতে তিন আনা মাত্র।

স্বার্থে কুলি-কামিন্ নিয়োগ করিলেও ত' অনেকগুলি লোক অনশন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়! যাহারা দশটী টাকাও খরচ করিতে পার না, তাহারা জন পিছে একটী করিয়া টাকা খরচ কর। গ্রাম পিছে যদি এ ভাবে তিন চারি শত টাকারও মাটির কাজ হয় এবং এই দৃষ্টান্ত যদি প্রত্যেকটী গ্রামে অনুসৃত হয়, তাহা হইলে দেখিবে, অতি অল্প সময়মধ্যে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস দূরে পলায়ন করিয়াছে।"

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা কেবলই উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, পুপুন্‌কী আশ্রমেও টাঁড় কাটিয়া ধান্য-জমি প্রস্তুতের কাজ সুরু করাইলেন। চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি কোনও প্রকারেই নিজের গ্রামে কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবে না, সে নারী হউক, পুরুষ হউক, বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যেন পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়া কাজ করে। পুপুন্‌কী আশ্রমের মাটির কাজ তত্ত্বাবধানের ভার পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শ্রীশ্রীবাবা গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সেই গ্রামেই নিজ নিজ গ্রামীর অনশন-ক্লিষ্টদের অন্ন সংস্থানের জন্য বিপুল আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। এ ভাবে গ্রামে গ্রামে মাটিকাটার কাজ সুরু হইয়া গেল এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ অন্ন অর্জ্জন করিতে লাগিল। গ্রাম গ্রামান্তরের অনশন-ক্লিষ্টেরা যাহাতে পুপুন্‌কী আশ্রমে আসিয়া ভিড় না জমাইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবাবা গ্রামে গ্রামে কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পুপুন্‌কী আশ্রমে সমাগত দরিদ্রদিগকে অর্থ দিয়া, চাউল দিয়া প্রতিপালন করিবার জন্য পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী আশ্রমের অপরাপর কর্ম্মিগণ সহ আশ্রমের ক্ষেত্র সমূহ নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও দিন আশ্রমে সমাগত বুভুক্ষু নরনারীর সংখ্যা একশত অতিক্রম

করিয়াছে। এই কার্য্যে অযাচক আশ্রমের কিঞ্চিন্ন্যূন তেরশত টাকা ব্যয়িত হইল। কিন্তু সকল গ্রামের সকল অধিবাসীরাই কিছু কিছু করিয়া কাজ দিয়া লোককে প্রতিপালন করাতে এবং কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত শ্রমের বিনিময়ে খাওয়াইয়া বাঁচানতে চাঁদা না তুলিয়া, আর্ত্তত্রাণ-সমিতি গঠন না করিয়া, সরকারী ঋণ গ্রহণ না করিয়া একটা ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখিতে না দেখিতে থামিয়া গেল।

শীতের ভ্রমণ-তালিকা

পুপুন্‌কীর দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার শীতের ভ্রমণ-তালিকা ত্রিপুরা জেলায় প্রচার করিলেন। বহুজনের আশাভঙ্গ-জনিত মনোবেদনার অপসারণ-কামনায় তিনি এক অতীব গুরুতর শ্রম-সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য কার্য্যের ভার স্কন্ধে লইলেন। প্রায় প্রত্যহ একটা করিয়া বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল এবং একদিকে সমবেত উপাসনা পরিচালনের শ্রম, অপরদিকে বহু দীক্ষার্থীকে দীক্ষাদানের শ্রম এবং তদুপরি আহার ও নিদ্রার দারুণ অনিয়ম সত্ত্বেও তিনি তালিকা অনুযায়ী যে আশ্চর্য্য শ্রম-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া কোথাও দেড় ঘণ্টা কোথাও দুই ঘণ্টা, কোথাও আড়াই তিন, এমন কি সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের বিস্ময় বোধ হইয়াছে।

কয়েকটি প্রীতিপ্রদ বিশেষত্ব

এই ভ্রমণকে আমরা শুধু ভ্রমণ মনে করি নাই। পরমারাধ্য সদ্-গুরুদেবের চরণ-সঙ্গে ভ্রমণকে আমরা তীর্থ-ভ্রমণের মর্য্যাদা দিয়া সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। এক একটা পল্লী যেন নিমেষের মধ্যে এক একটা পীঠস্থানে পরিণত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবার মত পতিতপাবন মহা-

পুরুষের শুভাগমন যে-কোনও পল্লীর পক্ষেই একটা স্মরণীয় এবং অসামান্য ঘটনা। তাঁহার জীবন অত্যাশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, শুধু এই জন্যই ইহা অসামান্য নহে ; পরন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা বাহিয়া অনাগত যুগে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নরনারী একদা অভয়পূর্ণ হৃদয়ে বীরবেশে চলিবে বলিয়াও যে-কোনও স্থানে তাঁহার শুভাগমন আমাদের দৃষ্টিতে অসামান্য। যাঁহাদের মধ্যে তিনি পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কেহই বুঝিতে অক্ষম হন নাই যে, ইহা সত্যই অসামান্য। ইহা এই ভ্রমণের একটী অতীব প্রীতিকর বিশেষত্ব।

প্রত্যেকটী গ্রামে আমরা আবেগ-বিহ্বল নরনারীর যে অপূর্ব্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের নয়ন-মন পবিত্র হইয়াছে।

প্রায় সকল স্থানেই যুবকের দল "অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরকী জয়" বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা এই ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—তোমরা জয়ধ্বনি দিতে চাহ ত' "সত্যকী জয়", "ধর্ম্মকী জয়" "প্রেমকী জয়" "ত্যাগকী জয়", "মনুষ্যত্বকী জয়", "দেবত্বকী জয়" প্রভৃতি ধ্বনি দাও।

লোকেরা একথা বড়ই প্রেম সহকারে মানিয়া নিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে কোথাও কোথাও নানা ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছেন,—"ধ্বনি তুলিতে চাও ত' তোল,—

কে চলেরে ?—ত্যাগী সকল।
কে চলেরে ?—ত্যাগী সকল।
কে চলেরে ?—ত্যাগী সকল।

কেমন চলে ?—তালে তালে।
কেমন চলে ?—তালে তালে।
কেমন চলে ?—তালে তালে।

কিসের বলে ?—ধর্ম্ম-বলে।
কিসের বলে ?—ধর্ম্ম-বলে।
কিসের বলে ?—ধর্ম্ম-বলে।”

“ধ্বনি তুলিতে চাও ত', তোল,—

কি চাই ?—ধর্ম্ম চাই।
কি চাই ?—ধর্ম্ম চাই।
কি চাই ?—ধর্ম্ম চাই।

কেমন ধর্ম্ম ?—ত্যাগের ধর্ম্ম।
কেমন ধর্ম্ম ?—ত্যাগের ধর্ম্ম।
কেমন ধর্ম্ম ?—ত্যাগের ধর্ম্ম।

কেমন ত্যাগ ?—বীরের ত্যাগ।
কেমন ত্যাগ ?—বীরের ত্যাগ।
কেমন ত্যাগ ?—বীরের ত্যাগ।”

“ধ্বনি তুলিতে চাও ত', তোল,—

লক্ষ্য কি ?—শুদ্ধ প্রেম।
লক্ষ্য কি ?—শুদ্ধ প্রেম।
লক্ষ্য কি ?—শুদ্ধ প্রেম।

পন্থা কি ?—জীবের সেবা ।
পন্থা কি ?—জীবের সেবা ।
পন্থা কি ?—জীবের সেবা ।

কেমন সেবা ?—নিষ্কলুষ ।
কেমন সেবা ?—নিষ্কলুষ ।
কেমন সেবা ?—নিষ্কলুষ ।

"ধ্বনি তুলিতে চাও ত' তোল,—

দুঃখ-নাশ—ভালবাসায় ।
দুঃখ-নাশ—ভালবাসায় ।
দুঃখ-নাশ—ভালবাসায় ।

প্রেমের জন্ম—শুদ্ধতায় ।
প্রেমের জন্ম—শুদ্ধতায় ।
প্রেমের জন্ম—শুদ্ধতায় ।

লক্ষ্য তোমার—অমরতা ।
লক্ষ্য তোমার—অমরতা ।
লক্ষ্য তোমার—অমরতা ।

জন্ম সফল—আত্মদানে ।
জন্ম সফল—আত্মদানে ।
জন্ম সফল—আত্মদানে ।"

দেশ-প্রচলিত মামুলি ধ্বনি সমূহ উচ্চারণ না করিয়া এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশক ধ্বনি সমূহ শ্রীশ্রীবাবা যেখানে যেখানে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে সানন্দ সমর্থন পাইয়াছে ।

আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটী গ্রামে আমরা যে অপূর্ব্ব প্রাণবত্তা, সজীবতা, ও উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাইয়াছি, সম্ভবতঃ দীর্ঘকালের ভিতরে বঙ্গদেশের পল্লীর বুকে এইরূপ বিশাল আকারে ও এমন ধারাবাহিক ভাবে এজাতীয় ব্যাপার ইহাই প্রথম। দিনের পর দিন পল্লীর পর পল্লীতে কণ্ঠের পর কণ্ঠে যে অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতার সহিত হরিনামের পবিত্র ধ্বনি অবিরাম শুনিয়াছি, আজ এতদিন পরেও তাহা যেন সদ্যঃশ্রুতের মত কানে বাজিতেছে এবং মরমে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। অবিরাম এবং প্রায় অনুক্ষণ নানা সুমধুর সুর-সহযোগে "হরি ওঁ"-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে এমন হইয়া গিয়াছিল যে, ইহার পরে তিন চারি মাস কাল কোথাও ক্ষণকালের জন্য কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া একটু চুপ করিয়া বসিলে অবিরাম সেই ত্রিপুরা-পল্লীর পথে-প্রান্তরে উচ্চারিত সুমধুর হরিনামই শ্রুতিগোচর হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বা মৌনাবলম্বন করিয়া পথ চলিতে চলিতে, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, হরিনামের পবিত্র ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহা জীবনের এক পরমসুখকরী অভিজ্ঞতা, এক পরমানন্দের স্মৃতি, এক পরম প্রেমের আস্বাদন।

দেবীদ্বার

২৮ অগ্রহায়ণ, ২৪ ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা এক্স্‌প্রেস ট্রেণে ফেনী ত্যাগ করিলেন। মাত্র কয়েকদিন হয় পুপুনকী হইতে আসিয়া এই কয় দিন দৈনিক বিশ বাইশ ঘণ্টা করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, নতুবা কাজ শেষ করা যায় না। ২৭ অগ্রহায়ণ রাত্রি দুইটার পরে শ্রীশ্রীবাবা শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ট্রেণে

উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবা নিদ্রিত হইলেন। ফেণীর ভ্রাতারা শ্রীশ্রীবাবাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। "হরি ওঁ" ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ফেণী ছাড়িল।

বেলা প্রায় বারটায় ট্রেণ কুমিল্লা পৌছিল। কুমিল্লার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ দলে দলে ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উলুধ্বনি ও হরিওঙ্কার-নাদের মধ্যে রিজার্ভ করা একখানা সেভেন-সীটার কুমিল্লা ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল।

মটর-অফিসে সামান্য একটু দেরী হইল। মটর ভাড়া দশটী টাকা চুকাইয়া দিবার পরে মটর দেবীদ্বার অভিমুখে রওনা হইল। গঙ্গামণ্ডল আসিবার পরে সেখানকার স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শ্রীশ্রীবাবাকে ফুলমাল্যে অলঙ্কৃত করিবার জন্য মটর থামাইলেন। এখানে ঘণ্টাখানিক বিলম্ব হইল।

দেবীদ্বারে আসিয়া পৌছিতেই গ্রামবাসীদের প্রেমবিগলিত কণ্ঠে উচ্চারিত মধুর নাম-কীর্ত্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। কীর্ত্তন করিয়া করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহারা অভ্যর্থনা করিয়া চলিলেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন-পল্লী-নিবাসী ভক্তহৃদয় দাদারা নিজ নিজ স্থান হইতে আসিয়া দেবীদ্বারে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণসঙ্গ লইলেন।

আমরা দত্ত-বাড়ীতে উঠিলাম। অখণ্ড ভ্রাতা অবনী দত্ত মহাশয়ের এম-এ পরীক্ষার মৌখিক দিনটী ঠিক এই তারিখেই পড়িয়াছে বলিয়া ব্যাকুল আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও তিনি আজ বাড়ী থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ এবং পিতৃব্য মহাশয়েরা প্রেমাশ্রু-বিগলিত নেত্রে অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বরের অভ্যর্থনা করিলেন। জননীগণের উলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইল।

শান্তির বারতা

আজ এখানে কোনও বক্তৃতা হইবার কথা ছিল না। কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকদের এবং দেবীদ্বার থানার দারোগা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবা এক-ঘণ্টা-ব্যাপী উপদেশ-ভাষণে সকলকে আনন্দিত করিলেন।

আত্মসংশোধনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনুক্ষণ আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্ম-সংশোধনের চেষ্টাকে উদ্যত ও জাগ্রত রাখ্‌তে হবে। ধর্ম্মের মূল এইখানে। মনের ভিতরে যেখানে যে প্রচ্ছন্ন পাপ রয়েছে, তাকে বিনষ্ট করার এইটী একটী বিশেষ কার্য্যোপযোগী পন্থা। প্রত্যেকটী পাপকার্য্য আমাদিগকে ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। অথচ সেই পরম প্রেমময়ের সঙ্গে নিত্য মিলনের মধুর সম্পর্ক স্থাপনই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সাধনা। ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরে পড়ি ব'লেই আমরা তাঁর সৃষ্ট জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। তাঁকে যে ভালবাসে, তাঁর সৃষ্ট জীবকে সে কখনো পর ব'লে জ্ঞান কত্তে পারে না। কিন্তু আমাদের অন্তরের সহস্রবিধ পাপ-সংস্কার, পাপাসক্তি, পাপ-প্রবণতা নিয়ত ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি কচ্ছে, যার ফলে তাঁর সৃষ্ট এই সুন্দর জগতের প্রত্যেকটী প্রাণী আমাদের পর, আমাদের শত্রু হয়ে যাচ্ছে। বাইরে আমরা শত্রু খুঁজে বেড়াই, অথচ ভিতরের শত্রুকে দিনের পর দিন শুধু বাড়্‌তেই দেই। সেই দিকে আমরা দৃষ্টিই দেইনা। তাই বলি, সকলের দৃষ্টি আজ অন্তর্ম্মুখিনী হোক্, চিত্তকে শুদ্ধ করার দিকে সকলের প্রবল লক্ষ্য হোক্। তবে ত আমাদের শান্তি লাভের যোগ্যতা হবে!

শান্তি ও পাপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—শান্তি আসে তার, যে নিষ্পাপ। পাপই অশান্তির মূল। অথবা পাপে আর অশান্তিতে নিত্য প্রণয়ের সম্বন্ধ। একটী আর একটীকে প্রবর্দ্ধিত করে। একটীর মৃত্যুতে অপরটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একটীর প্রশ্রয়ে অপরটী শাখা-প্রশাখায় ত্রিভুবন বেড়ে ধরে। একটীর শাখাচ্ছেদ হ'লে অপরটীও কবন্ধ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক শান্তিলিপ্সু জীব সর্ব্বপ্রযত্নে নিষ্পাপ হ'তে কর্ব্বে চেষ্টা। এই চেষ্টা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির মলয়-পবন বইতে সুরু করে। কিন্তু হাতে পায়ে নিষ্পাপ হ'লেই মানুষ নিষ্পাপ হয় না, অন্তর থেকে পাপের শিকড় গুলি টেনে তুলে ধ্বংস কর্ত্তে হবে। এক একটা পাপ-সংস্কার যেন বহুপ্রসারিতমূল বৃক্ষের মত চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম ও গুপ্ত শিকড় সমূহ চালিয়ে দিয়েছে। সেই সকল শিকড়-বাকড় সহ তাকে উন্মূলিত কর্ত্তে হবে। শান্তি আসবে এভাবে। ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, শত্রুকে কখনো তুচ্ছ ভেবনা। একশ জন বন্ধু তোমার আছে, কিন্তু তাদের ভরসা কত? একটী মাত্র শত্রু যদি তোমার থাকে, তবে তাতেই তোমার সর্ব্বনাশ হ'তে পারে। তাই পাপ-সংস্কাররূপ শত্রুকে নির্ম্মূল করার জন্য কৃতকর্ম্মা হ'য়ে অধ্যবসায়ী হ'তে হবে। তাতে অন্তরে শান্তি আসবে।

নাম শান্তি-স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ শান্তি-স্বরূপ, তাই তাঁর পবিত্র নামও শান্তি-স্বরূপ। ভগবানের নাম সর্ব্বপাপের মূলকে শিথিল করে, সর্ব্বপাপের সংস্কারকে ধ্বংস করে, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সর্ব্বপ্রকার পাপ-প্রবণতাকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও সর্ব্বশেষে বিনষ্ট করে। তাই নামেতে

সকলে একনিষ্ঠ হও, নামের ঐকান্তিক সেবায় মন প্রাণ বিনিয়োগ কর। ভগবানকে ভালবাসার জন্যই তাঁর প্রেমময় নামকে ভালবাস। তাঁর নামকে ভালবাসতে বাসতে তাঁর উপরে অপার প্রেমের উদয় হবে। নামই হচ্ছে প্রেমের মূল। নামেতে যে মনকে নিবিষ্ট করে, তার প্রাণ-মন প্রেমের রসে পূর্ণ হয়ে যায়। তার পক্ষে আত্মসংশোধন, আত্ম-শুদ্ধিস্থাপন অতি সহজ ও সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হ'য়ে যায়। চেষ্টা ক'রে তাকে আত্মসংশোধন বড় একটা কর্ত্তেই হয় না, সে কাজ নিজের স্বভাবে আপনা আপনি হ'য়ে যায়। তোমার চ'খের সাম্‌নে একটা কিছু জিনিষ এসে পড়্‌তে চাইলে তার আগেই যেমন স্বতঃ-প্রেরণায় চক্ষুর পাতা বন্ধ হ'য়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক্ তাই হয়। তোমার চিত্তদুষ্টি, ভাবদুষ্টি ও অসংযম-লোলুপতা দমনের জন্য নিজের চেষ্টা হবার আগেই আপনা আপনি ভিতর থেকে নামের শক্তি তার কাজ সুরু ক'রে দেয়।

হর

লন

নামের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের উপরে যে অসীম নির্ভর রচনা করে, জগতের সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎপাত তাকে আপনা আপনি পরিত্যাগ করে। নামের হচ্ছে এইটী এক আশ্চর্য্য মহিমা। নামের মহিমাকে মনে প্রাণে অনুক্ষণ স্মরণ কর, মনন কর, ধ্যান কর। নামের মহিমাকে অন্তরে চির-জাগরূক রাখ্‌বার জন্য অধ্যবসায় কর। মুখে বল, মনে ভাব, জাগ্রতে জান আর স্বপ্নে দেখ যে, নামৈব কেবলম্, নামৈব কেবলম্. নামই অদ্বিতীয় সহায়, নামই অনন্ত শরণ। এ ভাবে নামের মহিমা-চিন্তনে চিত্তকে চিরতরে পরিনিষ্ঠিত কর। নাম-গান গেয়ে কর্ণকে প্রপঞ্চ-মুক্ত কর, নাম-ব্রহ্মের রূপ দর্শন ক'রে চক্ষুকে

মায়াতীত কর, নামোচ্চারণ ক'রে রসনাকে লালসার জাল থেকে রক্ষা কর। নামের সঙ্গে প্রেম কর, প্রেমের সঙ্গে নাম কর। এভাবে নামের মহিমাকে নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। নামযশঃকামী প্রজল্পাভ্যাসী চিত্তকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার পন্থা কারা জানে? যারা প্রাণ ভ'রে প্রেমভরে নাম কত্তে জানে। নামকে যারা ভগবানের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি জেনে অসীম প্রীতি ও তৃপ্তি সহকারে সেবা কত্তে পারে। নামে প্রেমে মাখামাখি ক'রে যারা শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-সেবা কত্তে পারে। নামকেই আত্মার সকল ক্ষুধার, সকল তৃষ্ণার বিদূরণকারী জেনে যারা তাকেই আত্মার শাশ্বত আহারীয় শাশ্বত পানীয় রূপে নিরন্তর গ্রহণ কত্তে পারে। একথা অভ্রান্ত জান্‌বে যে, নামই সত্য, নামই নিত্য, নামই সর্ব্বজীব-জীবন ; নামই সর্ব্বস্ব, নামই সর্ব্বাবলম্বন, নামই সর্ব্বমঙ্গল-নিলয়।

নামের সেবা ও আত্মচেষ্টা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই নিত্য-মঙ্গল-বিধাতা নামে যে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণ করে, আত্মসংশোধনের জন্য তার পৃথক্‌বিধ কোনও চেষ্টার সত্যই আবশ্যকতা পড়ে না। কিন্তু প্রথম সময়েই কি তুমি সম্পূর্ণরূপে নামেতে আত্মনিমজ্জন কত্তে সমর্থ হবে? নাম পরিণামে যতই মধুর হোক্, প্রথমেই কি তোমার মুখে তা সুধাসম ব'লে আস্বাদিত হবে? যখন নামের আস্বাদন তোমার চখে মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তুমি পাবে, নামের বিক্রম ত' তখন থেকে প্রকটিত হ'তে থাক্‌বে! অতএব এখন তোমাকে একদিকে যেমন চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের জন্য আত্মানুসন্ধান ও আত্মশাসন ক'রে যেতে হবে, তেমন তারই সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম অবিশ্রাম নাম-সেবা কর্‌বে। নামের ভিতরে নিজেকে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত ক'রে দেবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুগপৎ পুরুষকার প্রয়োগ এবং নাম-সেবা চালাবে। নামে যেই মন

মজে গেল, তখন তোমার আর পুরুষকার খাটাবার কোনও প্রয়োজনই থাক্‌বে না, তখন আপনা আপনি দেহ ও মন, চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ঠিক্ পথে চল্‌বে, বিপথে চলার তাদের ক্ষমতাই থাক্‌বে না।

এক ঘণ্টা ধরিয়া এই ধর্ম্মোপদেশ লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিলেন। কিন্তু আমরা সবটুকু উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম কৈ? উপযুক্ত ভাবে বক্তৃতাগুলি যে লিখিত হইয়া রহিল না, এই খেদ আমাদের কখনও যাইবে না। যত স্থানে শ্রীশ্রীবাবা শুভবিজয় করিয়াছেন, প্রায় প্রত্যেক স্থানে একেবারে নূতন কথা সব বলিয়াছেন। জ্ঞানের ও অনুভূতির এই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে যে অমূল্য সম্পদ রাশি অকৃপণ ভাবে বিতরিত হইয়াছে, দুর্ভাগ্য যে, তাহা ধর্ম্মসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইবে জানিয়াও আমরা তাহা রাখার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।

সমবেত উপাসনা

সন্ধ্যার পরে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনার স্তোত্র সমূহের সুর-জানা অনেক গুরুভ্রাতা বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া উপাসনা বেশ জমিল। যেখানেই সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই আমরা শ্রীশ্রীবাবাকে বড়ই প্রফুল্ল দেখিতে পাই। কতবার আমরা শ্রীশ্রীবাবাকে বলিতে শুনিয়াছি,—"সুর জান আর না জান, তোমরা দুইটী লোকও যেখানে সমবেত উপাসনায় বসিয়াছ, জানিও, তোমাদের সংখ্যাকে তিন করিবার জন্য আমি নিজে আসিয়া তার মধ্যস্থলে উপবেশন করি।"

সমবেত উপাসনা শ্রীশ্রীবাবার এত প্রিয় যে, এই সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন সময়ে কত যে বিভিন্ন কথা বলিয়া ইহার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে আমরা শ্রীশ্রীবাবার বিভিন্ন সময়ের কথিত কয়েকটী উপদেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যথা:—

"কাহারও রোগ হইয়াছে? তাহার আরোগ্য কামনায় সমবেত উপাসনা কর। আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু সকলের কুশল কামনায় সমবেত উপাসনা কর। স্বজাতি, বিজাতি, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সকলের প্রাণে সাত্ত্বিকী ভগবৎপ্রীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়া সমবেত উপাসনা কর। দীন, দুঃখী, দরিদ্রের, অত্যাচারিত, নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিতের দৈন্য, দুঃখ দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা বিদূরণের কামনা লইয়া সমবেত উপাসনা কর।

"পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে? খণ্ড দেবতার পূজা করিয়া আনন্দোৎসবে কাহাকেও অবশ্য বাধা দিতে চাহি না। লোকে নিজ নিজ দীর্ঘ-পোষিত সংস্কার এক কথায় বা এক দিনে পরিত্যাগ করিবে কেন? কিন্তু তোমরা করিবে সমবেত উপাসনা। যে উপাসনায় আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে লইয়া ওঙ্কার ও ব্রহ্ম-গায়ত্রী উচ্চারিত হয়, যে উপাসনায় ভগবানের অভিলাষ পূরণের প্রার্থনা দিয়া স্তোত্র-পাঠ শেষ হয়, যে উপাসনায় ওঙ্কারকে শান্তিস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই উপাসনা।

"বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, গৃহ-প্রবেশ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গল-কর্ম্মে সমবেত উপাসনাকে করিবে প্রধান এবং প্রথম। দীর্ঘকাল-প্রচলিত লোকাচার অনেক সময়েই হিতাচার, কেননা অহিত-কর হইলে সমাজ তাহা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই লোকাচারও তোমাদের নিকট তেমন প্রাধান্য দাবী করিতে পারেনা, যেমন প্রাধান্য দাবী করিবে সমবেত উপাসনা। তোমাদের প্রত্যেকটী পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, যেখানে জন-সমাগম

স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয়, সেখানেই সমবেত উপাসনা হইবে তোমাদের প্রধান উপজীব্য এবং প্রধান কর্ম্মতালিকা।

"পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে, পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার কুশলার্থে এবং অনুরূপ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার হিতকর্ম্মে সমবেত উপাসনাকে প্রধান অবলম্বন, প্রধান আশ্রয় বলিয়া গণ্য করিবে।"

হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা

উপাসনান্তে দীক্ষার্থীদের দীক্ষা দেওয়া হইল। এখানে মাত্র একটী মহিলাকে দীক্ষা দিবার কথা ছিল, কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীদের একটা ভিড় হইল। অনেকে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা মাত্র চারিজনকে দীক্ষা দান করিলেন এবং বাকী সকলকে ভাল করিয়া আত্ম-পরীক্ষা করিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হুজুগে প'ড়ে দীক্ষা নিতে এস না, বাবা সকল। আত্ম-পরীক্ষা ক'রে দেখ, কিজন্য দীক্ষা নিতে চাও এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রাণের অকপট ব্যাকুলতা এসেছে কিনা। দীক্ষা নিলেই ত' হবে না, দীক্ষান্তে গুরূপদিষ্ট সাধন-ভজনে অকপট চিত্তে আত্মসমর্পণ কত্তে হবে। সাধন-ভজন প্রাণপণে কর্ব্বে কিনা, বাবা, সেইটী আগে বুঝে দেখ। পরে এসে দীক্ষা নিও।

পরের প্ররোচনায় দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্য লোকেরা দীক্ষা নিচ্ছেন দেখে তাঁদের দেখাদেখি দীক্ষা নেওয়াকে বলা যায় হুজুগে দীক্ষা। দীক্ষা নেওয়া অবশ্য ভাল কাজ। শুধু ভাল কাজ বল্লে কম বলা হবে, আমাদের দৃষ্টিতে দীক্ষা গ্রহণ হচ্ছে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং মহত্তম কাজ। দীক্ষা

নিতে পারা জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। দীক্ষা নেওয়ার মানে জীবনের অনিশ্চয়তার অবসান, পদ্ধতিবদ্ধ সাধনের সূচনা। এই জন্যই অপরের প্ররোচনায় প'ড়ে দীক্ষা নেওয়াও উচিত নয়। কেউ তোমাকে সৎপথ আশ্রয় কত্তে বলেছেন, এটাকে প্ররোচনা না ব'লে প্রেরণা বলা উচিত। কিন্তু দীক্ষার মত গুরুতর কাজ অপরের বুদ্ধিতে করা উচিত নয়। এ কাজটীতে নিজের অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগ, পরিপূর্ণ আকুলতা এবং পরিপূর্ণ সম্মতির প্রয়োজন। নিজের মনে দ্বিধা রেখে পরের কথায় চলা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রমাত্মক।

জোর করিয়া দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, কোনো কোনো মহাপুরুষেরা জোর ক'রেও দীক্ষা দেন। জোর ক'রে দীক্ষা দেওয়া ভাল কি মন্দ, তা মহাপুরুষেরা বুঝুন গিয়ে। কিন্তু কেউ জোর ক'রে দীক্ষা দিতে চাইলে, তা তোমার কিছুতেই নেওয়া উচিত নয়। বিকার-রোগীকে ডাক্তার জোর ক'রেই ঔষধ খাওয়ান, একথা সত্য। কিন্তু যতক্ষণ বিকার থাকে ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ জোর ক'রে খাওয়াতে হয়। দীক্ষার সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে না। দীক্ষাটী দিয়েই গুরু খালাস। তারপরে শিষ্যকেই ত' নিয়মিত প্রতিদিন প্রাতে, দুপুরে, সায়াহ্নে ও শয়নকালে দীক্ষা-প্রাপ্ত নামের সেবা কত্তে হবে। একটীবার মাত্র গুরুদেব মন্ত্রটী কর্ণ-কুহরে শুনিয়ে দিলেই ত' আর হ'ল না। তাই জোর ক'রে দেওয়া দীক্ষাও গ্রহণ কত্তে নেই।

দীক্ষা ও গুরুজনের সম্মতি

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের আগে পিতামাতা এবং

অপরাপর গুরুজনদের সম্মতি নিয়ে আসা ভাল। তাতে সাধন-পথের কাঁটা কমে। স্ত্রীদের পক্ষেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, নইলে বড় বিঘ্ন হয়। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, যাঁরা দীক্ষা দেবার কালে গুরুজনের অনুমতির তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁদের প্রদত্ত দীক্ষা অনেক সময়ে পূর্ব্বসম্বন্ধীদের সাথে দীক্ষাপ্রাপ্তের একটা গুরুতর আদর্শগত সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে দেয়। যেখানে সমাজের প্রচলিত অন্ধতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত কাজ কত্তে চায়, সেখানে এরূপ অবস্থা কতকটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি তোমাদের সমাজকে কিভাবে সংস্কৃত কত্তে চাই জান? তোমরা তোমাদের পিতামাতার সম্মতি নিয়ে এসে দীক্ষা পাবে এবং দীক্ষার শক্তিতে সেই সমাজের ভিতরে প্রবেশ ক'রেই কুসংস্কারের জঞ্জাল দূর কত্তে লেগে যাবে, যেই সমাজের ভিতরে তোমার, তোমার পিতামাতার, তোমার পিতামহ-মাতামহের জন্ম, পুষ্টি ও বিকাশ। জীর্ণ সমাজকে নূতন আদর্শ দিতে হবে, কিন্তু তার প্রতি শত্রুভাব পোষণ ক'রে নয়, তাকে আপন জেনে। যাদের চিরপ্রচলিত মত ও পথ তুমি পরিত্যাগ ক'রে এসে নব্যমন্ত্রে নব্যতন্ত্রে দীক্ষা নিলে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা তোমার কাজ হবে না, তাদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাদের দৃঢ়মূল সংস্কারকে তাঁদেরই সমর্থনের মধ্য দিয়ে টেনে উৎপাটিত কত্তে হবে। এজন্যই আমার কাছে যদি আস, গুরুজনদের সম্মতি নিয়ে আস্‌বে।

দীক্ষা মানে নবজন্ম

দীক্ষার্থীদিগকে দীক্ষাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—মনে রেখ, আজ তোমাদের নবজন্ম হ'ল। অতীতের সমস্ত পাপ-তাপ তোমাদের চিরতরে পরিত্যাগ কর্ল! শুদ্ধ, স্নাত শিশুটীর মত আজ

তোমরা নিষ্পাপ হ'লে। তোমাদের অতীতের জ্ঞাত অজ্ঞাত সহস্র পাপরাশি আজ বিনষ্ট হ'ল। জেনে যত পাপ ক'রেছ, না জেনে যত পাপ করেছ, বুঝে যত পাপ করেছ, না বুঝে যত পাপ করেছ, দেহে যত পাপ করেছ, মনে যত পাপ করেছ, বাক্যে যত পাপ করেছ, অভিপ্রায়ে যত পাপ করেছ, জাগ্রতে যত পাপ করেছ, নিদ্রায় যত পাপ করেছ, সব পাপ আজ তোমাদের বিদূরিত হ'ল। নিজের ইচ্ছায় যত পাপ করেছ, পরের প্ররোচনায় যত পাপ করেছ, স্ববশে যত পাপ করেছ, অবশে যত পাপ করেছ, নিজের স্বার্থে যত পাপ করেছ, পরের জন্য যত পাপ করেছ, প্রয়োজনে যত পাপ করেছ, নিষ্প্রয়োজনে যত পাপ করেছ, অভ্যাস বশে যত পাপ করেছ, খেয়াল বশে যত পাপ করেছ, সব পাপ আজ তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আজ সঙ্কল্প কর, আর পাপের সঙ্গে কোনো আপোষ কর্ব্বে না। আজ প্রতিজ্ঞা কর, এর পর থেকে জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে পূর্ণ পবিত্রতার মধ্য দিয়ে যাপন কর্ব্বে।

প্রেমের কান্না

২৯ অগ্রহায়ণ প্রাতে ৭টায় হরি-ওঁ-কীর্ত্তনের উচ্চরোলের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা দেবীদ্বার হইতে রওয়ানা হইবার উদ্যোগ করিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে কত জনের আপন হইয়া গিয়াছেন, তাহা যাইবার সময়ে শত শত নরনারীর নয়নে উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারার মধ্য দিয়া ধরা পড়িল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রেমের অশ্রু জীবন-বৃক্ষের মূলকে করে দৃঢ়; কাণ্ড, শাখা এবং প্রশাখাকে করে সবল; পত্র, পুষ্প এবং কিশলয়কে করে সুকান্ত, সুন্দর ও মনোহর। যে পারো সে কাঁদো, প্রেমেরই কান্না কাঁদো, শোকের নয়, রোষের নয়, মায়ার নয়। প্রেমের কান্না জীবনকে

পাপমুক্ত করে, মেদমুক্ত করে, ভারমুক্ত করে, দ্রুত-গমন-শীল করে মোহের কান্না জীবনকে মেদগ্রস্ত, ভারগ্রস্ত, দুর্ব্বহ ও ধারণের অনুপযোগী করে। আর রোষের কান্না জীবনকে হতাশ, দুর্ব্বল, পরিক্লান্ত ও অকর্ম্মণ্য করে। প্রেমের কান্না জীবে জীবে সত্য সম্বন্ধকে পরিষ্কার ক'রে স্থাপন করে। সুতরাং, যে কাঁদ্‌তে জানো, শুধু প্রেমের কান্না কাঁদো, মোহের কান্না নয়, মায়ার কান্না নয়, দুর্ব্বলতার কান্না নয়, বিকলতার কান্না নয়।

আমি কি চলিয়া যাইব ?

একজন ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, আবার আপনি কবে আস্‌বেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি কি চলে যাচ্ছি যে, আবার আসার কথা ভাবছ ? আমি নিত্যকাল তোমাদের ভিতরে বিরাজ কর্ব্ব। তোমাদের অন্তরে বাহিরে, তোমাদের জ্ঞানে, কর্ম্মে, তোমাদের সুখে-সম্পদে, তোমাদের দুঃখে-সঙ্কটে, তোমাদের উত্থানে পতনে, তোমাদের জীবনে মরণে অনুক্ষণ আমি তোমাদের আপনার আপন হ'য়ে থাক্‌ব। চলে যাব ব'লে আমি তোমাদের কাছে আসিনি, তোমাদের নিয়ে নিত্যকালের আনন্দ-কেলি কর্‌ব ব'লে, শাশ্বত প্রেমের লীলা কর্ব্ব বলেই তোমাদের মধ্যে এসেছি। একজনেও বিশ্বাস ক'রো না যে আমি চ'লে যাব।

আবার কখন আসিব

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—কিন্তু বাবা আমরা ত' সেকথা অনুভব কত্তে পার্ব্ব না! আমরা ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি আপনি সত্যই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পার্ব্বে হে, পার্ব্বে, অনুভব কত্তে পার্ব্বে। তিনটী ব্যক্তি মিলে যখন সমবেত উপাসনা কর্ব্বে, জান্‌বে আমি তোমাদের ভিতরে এসে প্রকট হ'য়েছি। তোমাদের ঐ উপাসনার মধুময় কণ্ঠ-ধ্বনির সম্মিলিত রেশের ভিতর দিয়ে আমি আত্মপ্রকাশ কর্ব্ব। দুটী লোকে শুন্‌বে আর একটী লোকে শুনাবে, এভাবে যখন তোমরা আমার উপদেশ পাঠ কর্ব্বে, তখন সেই গ্রন্থ পাঠের ধ্বনির ভিতরে আমি আত্ম-প্রকাশ কর্ব্ব। আমার কান্তবাণী, আমার মিত্রবাণী, আমার রাজবাণী সেই পাঠকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে বহির্গত হবে। আর, অকপট চিত্তে যখন ভগবন্নাম কর্ব্বে, তখন তোমার প্রত্যেকটী শ্বাসের আর প্রশ্বাসের ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে ধরা দেব। তখন তোমরা স্পষ্ট অনুভব কত্তে পার্ব্বে যে, আমি পুনরায় তোমাদের মধ্যে এসেছি।

দীক্ষার মর্ম্মগ্রাহিনী মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন্ত্রদান কি শুধু একটা শব্দ শুনিয়ে দেওয়া? দীক্ষা-দানের মানে হচ্ছে আমার শব্দরূপ সত্তায় তোমাদের দেহ-মন-প্রাণের প্রত্যেকটা পরতে, প্রত্যেকটা তরঙ্গে, প্রত্যেকটা অনুতে পরমাণুতে প্রবেশ করা। তোমাদের কর্ণ-রন্ধ্র-পথে আমি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে, তোমাদের প্রতি অঙ্গের প্রতি প্রত্যঙ্গে, তোমাদের প্রতি প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটী অংশে এই ব'লে প্রবেশ ক'রে রইলুম যে, তোমাদের আমি জগতের মঙ্গলের কাজে পরিচালিত কর্ব্ব, জগতের মহৎ কল্যাণে প্রেরণা যুগিয়ে যাব। ইচ্ছা ক'রেও আজ আর তোমরা আমাকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পার না। আমার যা প্রকৃত সত্তা, আমার যা প্রকৃত মূর্ত্তি, আমার যা প্রকৃত স্বরূপ, সে তোমাদের ভিতরে, অন্তরের

অন্তঃস্থলে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, জ্ঞান-ও কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলি মূলদেশে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলেছে। এরই নাম দীক্ষা, এরই নাম শিষ্য-গ্রহণ। দীক্ষার এইটা হচ্ছে মর্ম্মগ্রাহিনী মূর্ত্তি।

শিষ্যের জগন্মঙ্গল-প্রয়াসে গুরুর নব নব আবির্ভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সুতরাং জগৎ-কল্যাণের অমোঘ প্রেরণা নিয়ে যখন তোমার যে অঙ্গ যে-কোনও কাজ কর্ব্বে, জান্‌বে আমি তোমাতে এসেছি। তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার জিহ্বা, তোমার ওষ্ঠ, তোমার বক্ষ, তোমার পৃষ্ঠ, তোমার উদর, তোমার শ্রোণি, তোমার প্রকাণ্ড ইন্দ্রিয়সমূহ, তোমার গুপ্তাঙ্গ সমূহ সবকিছুর ভিতরে আমার হবে তখন আবির্ভাব, যখন তুমি তাকে কর্ব্বে ব্যবহার জগন্মঙ্গল উদ্দেশ্যে। তুমি একথা জাননা, তাই আমি জানিয়ে দিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার এটাই প্রাণের সবচেয়ে প্রিয়তম কামনা যে, তোমাদের দেহ-মন-প্রাণ যেন অবিরাম জগৎ-কল্যাণের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে আমার সেই নিত্য নব আবির্ভাবকে উপলব্ধি করে। দেহের প্রতি অংশের প্রত্যেকটী পিপাসাকে জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মের প্রেরণায় তোমরা রূপান্তরিত কর· তোমাদের জগন্মঙ্গল প্রয়াস তোমাদের ভিতরে আমার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবকে উপলব্ধি করাক।

সরকারী চাকুরী

এই গ্রামে একটী সরকারী পাট নিয়ন্ত্রণ অফিস আছে। তাহাতে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবভক্ত চাকুরী করেন। পোনরা যাইবার পথে তিনি তাঁর অফিসটী একবার দেখিয়া যাইবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ ভাবে ধরিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সম্মতও হইলেন।

অফিসটী বড় সুরুচিসঙ্গত ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে। দেখিলে একটা সরকারী অফিস বলিয়া মনে না হইয়া একজন ভক্তব্যক্তির জনহিত-কামনার বহিঃপ্রকাশ বলিয়াই মনে হয়।

বড়ই আনন্দিত চিত্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে, পুণ্য ভারতভূমিতে যার জন্ম হয়েছে, সে প্রাণ ভ'রে পরোপকার কর। এই পরোপকার শব্দের মানে হচ্ছে পরম উপকার, শ্রেষ্ঠ উপকার, যার চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপকার আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, যে সব ক্ষুদ্র উপকার শ্রেষ্ঠ উপকারের অনুপূরক হবে, তা কিন্তু কর্ব্বে না। মোট কথা, কিসে জীবের উপকার হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেষ্ঠতম উপকার করাকে প্রধান আদর্শ জ্ঞান ক'রে জনসেবকেরা নিজ নিজ সাধ্য-শক্তি মত যার যতটুকু পারে, নিষ্কাম হিতসাধন কর্ব্বে। আপনাদেরও সেই ব্রত। দেশ থাক্‌লেই সরকার থাকে, সরকার থাক্‌লেই তার চাকুরী থাকে, কিন্তু চাকুরীর উদ্দেশ্য শুধু নিজের পেট-পূরণ নয়, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী প্রভৃতির ভরণ-পোষণ নয়, চাকুরী মাত্রেরই উদ্দেশ্য ভগবান্‌কে সেবা করা, ভগবানের জীবদের সেবা করা, সেবা-বুদ্ধি নিয়ে স্থির মনে বিনীত প্রাণে জগদ্ধিত-বর্দ্ধনের চেষ্টা করা। সরকারেরও সরকার আছেন, শাহানশা'রও শাহানশাহ আছেন, সরকারী চাকুরীর মধ্য দিয়ে সেই ত্রিলোকেশ্বরের সেবা করা। এই কথা অন্তরে জ্বলন্তভাবে জাগ্রত রেখে চাকুরী কর্ব্বেন। দেখ্‌বেন ইহকালের সেবার মধ্য দিয়েই পরকালের কাজ কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

পোনরা

যথাকালে শ্রীশ্রীবাবা পোনরা গ্রামে উপনীত হইলেন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার লোধের গৃহে অবস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আমি চিনি মানুষকে

স্নানান্তে শ্রীশ্রীবাবা উপাসনা পরিচালন করিলেন। সর্ব্বজাতীয় সর্ব্বদলের লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে পারেন শুনিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন,—অহিন্দুরাও কি এই উপাসনায় এসে আমাদের সঙ্গে বস্‌তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি হিন্দু-মুসলমান চিনি না, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানও চিনি না, আমি চিনি মানুষকে। সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে যে মানুষ প্রাণের অনুরাগ উপলব্ধি কর্ব্বে, এতে তারই থাকবে অধিকার। কিন্তু একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টান তার নিজ ধর্ম্মের অনুশাসন সমূহ মান্য ক'রে এতে এসে যোগ দিতে অধিকারী কিনা, সে বিচারও তার নিজেরই কর্ত্তে হবে। যে ব্যক্তি তোমাদের এই উপাসনার তত্ত্বকে সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে সত্য বলে জ্ঞান করেছে, তাকেই যোগ দিতে দেবে। এই উপাসনা বিশ্বাসীর উপাসনা, অবিশ্বাসীর নয়।

সমবেত উপাসনায় যোগদানের কে অধিকারী?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপাসনায় যোগদানে সেই অধিকারী, যে স্বীকার করে যে, ওঙ্কার সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্বতন্ত্রের সমাহার, অনাদি এবং অনন্ত মহানাদ। যে শুদ্ধ স্নাত হয়ে ভক্তি-বিনম্র চিত্তে এসেছে। এই উপাসনা থেকে নিত্যানন্দ ও পরমসুখ আহরণই যার উদ্দেশ্য, অন্য কোনও অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, অশান্তিকর উদ্দেশ্য যার নেই। এইটুকু যদি খাঁটি থাকে, তারপরে আর তোমার বিচারের প্রয়োজন নেই যে, যে যোগ দিয়েছে, সে কার ঘরে জন্মেছে, তার জীবিকা কি।

স্নান সারিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধেরা বিভিন্ন সারিতে সুশৃঙ্খল ভাবে বসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা উদাত্ত কণ্ঠে সুমধুর স্বরে স্তোত্রাবলী গাহিয়া যাইতে লাগিলেন, সমবেত ভক্তমণ্ডলী তাহা প্রেমপূর্ণ অন্তরে পুনরুচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সুমোহন প্রণব-মন্ত্র-ধ্বনিতে পোনরা গ্রাম যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

সত্যযুগের পূর্ব্বাভাস

উপাসনান্তে দীক্ষা হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতরেও দীক্ষা গ্রহণের এমন এক আশ্চর্য্য প্রেরণা আসিয়াছে যে, বাপ-মায়ের পক্ষে শিশুদের ঠেকাইয়া রাখা এক কঠিন ব্যাপার হইল। শ্রীশ্রীবাবা কৌশলে দুই চারি জনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু বলিলেন,—সত্যযুগের পূর্ব্বাভাস দেখা যাচ্ছে, নতুবা দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর ভিতরে ধর্ম্মলাভের এই গভীর উন্মাদনা কে সৃষ্টি করল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান আজ শিশুরূপে আপনাদের গৃহে জন্মেছেন, নিজেদের ধর্ম্মব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজ নিজ পিতা-মাতার মোহ-তন্দ্রা ঘুচিয়ে দেবার জন্য। তাই শিশুদের এই ব্যাকুলতা।

একটী মহিলার স্বামী এখন গৃহে নাই, এজন্য তিনি দীক্ষার্থ স্বামীর অনুমতি নিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—তোমার স্বামী যখন গৃহে আস্‌বেন, তখন তাঁর অনুমতি নিয়ে গ্রামান্তরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, দীক্ষা তখন পাবে।

কিন্তু মহিলাটী কিছুতেই মানিলেন না। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার জনৈক ভ্রমণ-সঙ্গীকে উপদেশ দিলেন, মহিলাটীকে আপাততঃ প্রতিনিবৃত্ত

করিতে। বহু যুক্তির পরেও মহিলাটীকে বুঝান গেল না। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন,—স্বামীর আমি অনুমতি পাবই, তিনি আমার ধর্ম্মকার্য্যে কেন বাধা দেবেন, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনুমতি নেবার পরে দীক্ষাটী নিলে কাজটা যত সহজ হবে, দীক্ষা নেবার পরে অনুমতিটী তত সহজে নাও পেতে পার। এক্ষেত্রে প্রতীক্ষাই ভাল মা, প্রতীক্ষাই ভাল।

কিন্তু মহিলাটী জিদ্ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমি জানি, আমার স্বামী আমাকে অনুমতি দেবেন। আর যদি দীক্ষা নেবার জন্য আমাকে লাঞ্ছিত হ'তে হয়, উৎপীড়িত হ'তে হয়, বেত-কাঁটার উপর দিয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আমাকে লাঠি মারে, লাথি দেয়, কিল্ দেয়, তবু আমি দীক্ষা নিবই নিব।

মহিলাটির অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া আর তাহাকে প্রতিরোধ করা গেল না, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা বড়ই চিন্তিত মনে তাঁহাকে দীক্ষার্থ সম্মতি দিলেন। বলিলেন,—সত্যযুগ ফিরে আসছে, একথা সত্যই, কিন্তু মধ্য-পথে বড় উৎপীড়ন, বড় লাঞ্ছনা, বড় মারামারি, বড় কাটাকাটি দেখতে পাচ্ছি।

তৎপরে হাসিতে হাসিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেবাসুর সংগ্রামটা সত্যযুগেই হয়েছিল কিনা!

তোমরা ব্রাহ্মণ

দীক্ষাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—তোমরা যে ব্যক্তি যে বংশেই জন্মে থাক না কেন, জান্‌বে, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আমার সন্তানের অপর কোনও জাত নেই। তোমার পিতা,

মাতা বা পূর্ব্বপুরুষেরা আর্য্য ছিলেন কি অনার্য্য ছিলেন, তার আর বিচারের কোন প্রয়োজন নেই। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তোমরা এতদিন বৈশ্য, কায়স্থ, তেলী বা শূদ্র যেনামেই পরিচিত হ'য়ে এসে থাক না কেন, আজ থেকে, এই মুহূর্ত্ত থেকে তার আর উত্থাপনের পর্য্যন্ত প্রয়োজন নেই। তোমরা ব্রাহ্মণ, আজ থেকে অনন্ত কালের জন্য ব্রাহ্মণ। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষদের পরমাবলম্বন ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রের মহিমায় তোমাদের ক্ষত্র-শূদ্রাদি-জাতিত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। মন থেকে সকল হীনতা-বোধ দূর ক'রে দাও, নিজেকে জগতের একটি মানুষের চেয়েও আর নিকৃষ্ট ব'লে জ্ঞান ক'রো না, তোমরা ব্রাহ্মণ এবং তোমরা প্রত্যেকে সমান। প্রতিজ্ঞা কর, ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা তোমরা রক্ষা ক'রে চল্‌বে, ব্রাহ্মণোচিত সদাচার তোমরা পালন কর্ব্বে, ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্য ও সমদর্শিতা তোমরা অর্জ্জন কর্ব্বে। প্রতিজ্ঞা কর, নিজ নিজ জীবনের ত্যাগ, তপস্যা এবং সংযমের প্রভাবে জগতে ব্রাহ্মণের মহিমা প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বর্দ্ধন কর্ব্বে। নামে মাত্রই তোমরা ব্রাহ্মণ হ'য়ো না, কাজেও ব্রাহ্মণ হ'তে হবে। জগৎ থেকে তোমরা ভেদবুদ্ধি বিদূরিত কর। জগতের প্রান্তে প্রান্তে প্রেম-বাহু প্রসারিত কর, ছোট-বড়, পাংক্তেয়-অপাংক্তেয়, দীন-ধনী, দুর্ব্বল-সবল, পাপি-পুণ্যবান, উন্নত-অবনত সকলকে টেনে এনে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ কর, সবার পক্ষে ব্রাহ্মণ হবার পথ খুলে দাও, সবাইকে ব্রাহ্মণ কর। অপরকে ব্রাহ্মণ করা মহত্তম কর্ত্তব্য, কেন না তোমরা নিজেরা যে আজ ব্রাহ্মণ হয়েছ।

সূক্ষ্ম শরীরের কাজ

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে ফুলতলী গ্রাম হইতে জনৈকা সন্ত্রান্ত মহিলা

আগমন করিলেন, তাঁহার স্বামি-বিয়োগের পর হইতেই তিনি অতীব উন্নত সাধিকা-জীবন যাপন করিতেছেন। একদা তিনি নিজ গ্রামের শ্মশানে গভীর রজনীতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময়ে নাকি জনৈক মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। পুনরায় দেখা দিবেন বলিয়া নাকি সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হন।

মহিলাটী শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন যে, ইনিই সেই। শ্রীশ্রীবাবার পাদস্পর্শ মাত্র মহিলাটীর সমগ্র শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণের বিকাশ হইল এবং কিছুকাল পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কাষ্ঠখণ্ডবৎ পতিত হইলেন।

অশ্বিনীবাবুর পরিবারস্থ মহিলারা আসিয়া পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইহার কর্ণে মাঝে মাঝে "হরি-ওঁ" কথাটী শুনাবে। এতেই যথাকালে এঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসবে।

একথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা সভাস্থলে অগ্রসর হইলেন। কেননা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক্ তিনটায় সভারম্ভ করিতে হইবে।

একজন সঙ্গী শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্মশানে দর্শনদান ব্যাপারটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এসব হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীরের কাজ, যে কাজ নিজে কোনও সঙ্কল্পের অধীন হ'য়ে কত্তে হয় না। জীবের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছাবিহার আত্মা যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্থূলরূপ ধারণ ক'রে সাময়িক ভাবে কারো কোন বিশেষ উপকার ক'রে দিয়ে এলেন। আমি যখন এক বছরের জন্য মৌনী ছিলাম, তখন এরূপ ঘটনা আরো অনেক ঘটেছে। এগুলি অলৌকিক কিছুই নয়, নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার ব'লে এগুলিকে মনে কর্ব্বে। আমি যখন দেহত্যাগ কর্ব্ব, তখন আমার একান্ত-

অনুগতেরা অনুক্ষণ এভাবে সূক্ষ্ম সাহায্য লাভ কর্ব্বে। তোমাদের প্রত্যেকেরই স্থূল দেহটার ন্যায় একটা সূক্ষ্ম দেহও আছে। সেই দেহ যখন সঙ্কল্প ও বিকল্পের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়, তখন সে অভাবনীয় ভাবে প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করে। এর সঙ্গে জড়জগতের কোন হিসাব নিকাশের প্রশ্ন নেই। তুমি হয়ত জানবেইনা যে, তোমার সূক্ষ্ম দেহ কোথায় গিয়ে কি আশ্চর্য্য ভাবে জীবের হিতসাধন ক'রে এল। এই মহিলাটী মিথ্যা বর্ণনা করেন নি, কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে আমার নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব বা সঙ্কল্প-বিকল্প নেই।

ধর্ম্মসভা

ঠিক তিনটায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইল। ত্রিপুরা-জেলা নিবাসী আমাদের একজন গুরুভ্রাতা ভারতের ধর্ম্মজীবন সম্পর্কে প্রথমে কিছুক্ষণ বলিলেন। কালী, কৃষ্ণ, রাধা, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অর্চ্চনার জন্য অধ্যবসায় প্রয়োগ যে আবশ্যক নহে, একমাত্র প্রণবরূপী পরমেশ্বরকে ভজনা করিলেই যে সকলের ভজনা করা হয় এবং সকল প্রকার পৃথক্ পৃথক্ ভজনের চরম ফল ও পরম প্রাপ্তি একসাথে পাওয়া যায়, এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার চিরকালপ্রদত্ত উপদেশ সমূহের প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি যে ভাষণ দিলেন, তাহা সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। নিজের ব্যক্তিগত মতামতকে প্রধান না করিয়া বা ব্যক্তিগত যুক্তি-বিচারকে স্বাতন্ত্র্য না দিয়া তিনি আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবেরই যুক্তি, বিচার ও বাণীকে শ্রোতাদের নিকটে উপস্থাপন করিতে লাগিলেন দেখিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী অধিকতর পরিতৃপ্ত হইলেন। কেননা, অন্য কোনও বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য শ্রোতারা আগ্রহী ছিলেন না, সকলেই শ্রীশ্রীবাবার বাণী

শুনিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু আমাদের অদ্যকার বক্তা এই গুরুভ্রাতাটীর বক্তৃতার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীবাবারই বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়া সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে শুনিলেন। সত্যই, নিজেকে, নিজের ব্যক্তিগত রুচিকে, জেদকে, চাপিয়া রাখিয়া যে আচার্য্যের বাণীকে নিজের বাক্যে ও জীবনে রূপ দিতে চাহে, সে সর্ব্বত্র আচার্য্যেরই সম্মান পাইয়া থাকে।

চাই আত্মবলিদান

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতারম্ভ করিলেন। সভাস্থলে তিলধারণেরও স্থান ছিলনা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চাই আত্মবলিদান। পরম আদর্শের অনুসরণ-কার্য্যে আপোষ রেখে চ'লনা। নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে তোমার প্রাণের ধনকে প্রাণের আপন কর। যে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে, তার আরাধ্যও তার নিঃশেষেই আপন হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা চাও ত' জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ প্রদান কর। নিজেকে বিসর্জ্জন দেওয়ার ভিতরেই নিজেকে পাওয়ার পথ। সংসারেও নয়, সন্ন্যাসেও নয়, জীবনারাধ্যের সেবায় আত্মবলিদানেই অমৃতের অনন্ত উৎস বিরাজিত।

আত্মদানের বিঘ্ন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মবলিদানের বিঘ্ন হচ্ছে, ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় ক'রে দেখা, ক্ষণিক সুখকে পরম সুখ ব'লে বিবেচনা করা, অল্পকে ভূমা ব'লে ভ্রম করা। অপর বিঘ্ন হচ্ছে ভয়। ব্যক্তি-সুখের লালসা যার যত বেশী, অন্তরের ভয় তার তত বেশী। ভয়কে আজ জয় কত্তে হবে। মৃত্যু-ভয়, শাসনের ভয়, লাঞ্ছনার ভয়, গঞ্জনার ভয়, অত্যাচারের ভয়, উৎপীড়নের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, অসাফল্যের ভয়, ভূতের ভয়, প্রেতের

ভয়,—সকল রকমের ভয়কে আজ পদদলিত কত্তে হবে। ভয় নাই তার, যার আছে ভালবাসা। ভালবাসা ভয়কে জয় করে, ভালবাসা ইষ্টনিষ্ঠা দেয়, ভালবাসা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা দেয়। প্রাণভরা যার ভ লবাসা, ভয়লেশহীন তার চিত্ত। তোমরা আজ ভালবাস্‌তে শিখ মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, চিত্ত দিয়ে, আত্মা দিয়ে, জীবনের আরাধ্যকে ভালবাস্‌তে শিখ। যে ভালবাসা অকপট, যে ভালবাসা অপার, অসীম, অনন্ত ও অতলস্পর্শ, যে ভালবাসা ইহকাল পরকালের সকল পরিধিকে ছাড়িয়ে আত্মবিস্তার করে, যে ভালবাসার আর দ্বিতীয় নেই, সেই ভালবাসা বাস্‌তে শিখ। আত্মদানের সকল বিঘ্ন আপনি দূর হয়ে যাবে।

চিন্তা-চেষ্টাকে ইষ্টমুখী কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লক্ষ্য রাখ স্থির, চিত্ত রাখ অচঞ্চল, সঙ্কল্প রাখ অটুট যে, তোমরা তোমাদের জীবনারাধ্যকে যে ভালবাসা দেবে, তার ভিতরে আত্মসুখের কামনাকে ঢুকতে দেবেনা। সঙ্কল্প রাখ যে, ইষ্টের প্রীতিই তোমার প্রীতি, ইষ্টের তৃপ্তিই তোমার তৃপ্তি, ইষ্টের সন্তোষই তোমার সন্তোষ, নিজের কোনও পৃথক্ প্রীতি, পৃথক্ তৃপ্তি বা পৃথক্ সন্তোষ খুঁজবেনা। নিজের সমস্ত চিন্তা-চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে ইষ্টমুখী কর, আত্মমুখী করো না। আত্মমুখী চিন্তা-চেষ্টা আত্মসুখ চায় কিন্তু কোনো সুখই পায় না। ইষ্টমুখী চিন্তা-চেষ্টা আত্মসুখকে একেবারে ভুলে যায়, ইষ্টসুখই তার একমাত্র কাম্য হয় এবং না চেয়েও সে নিত্যসুখকে পায় এবং পাওয়া-দেওয়ার অতীত জগতে সে নিত্যানন্দের আস্বাদন লাভ করে। জন্ম-মরণের অতীত এসব কথা,—ভাষার ভিতর দিয়ে একে বোঝাও যায় না, বোঝা যায় শুধু আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে।

আগামী যুগের ত্যাগিগণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দিকে দিকে আত্মোৎসর্গকারী মহাতপা মহর্ষিরা নবনরবপু গ্রহণ ক'রে আবির্ভূত হচ্ছেন। একথাকে শুধু কল্পনা ব'লেই জ্ঞান ক'রো না। নিজেরা নিজেদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে দিয়ে সেই সব উৎসর্গকারীদের পরিচয় নাও। নিজের মুণ্ড নিজে কেটে দিয়ে হাসি-মুখে যারা জগতের হিতকামনা করে, পরমতৃপ্তিতে যারা জগৎপতির তৃপ্তিসুখ অনুধাবন করে, সেই ত্যাগী মহতের দল অদূরে আছেন দাঁড়িয়ে। তাঁদের প্রেমময় প্রাণের কোমল প্রকোষ্ঠে নিজের সর্ব্বস্বত্যাগের শক্তি দিয়ে প্রবেশ কর এবং ভেতরের সেই ত্যাগের স্ফুলিঙ্গকে ইষ্টনামের একটি পবিত্র ফুৎকারে জাগিয়ে তোল, জ্বালিয়ে দাও। এইটুকু যে তোমাদের এক পরমমহৎ কর্ত্তব্য, এই কথা বিস্মৃত হ'য়ে যেও না। আগামী যুগের ত্যাগিগণ সেই পথেই ত' পাদচারণা ক'রে জগদ্ধিতে ও ইষ্টসাধনে অগ্রসর হবেন, যে পথে চ'লে তোমাদের অনাবৃত চরণ বারংবার নির্ম্মম কণ্টকের নিষ্ঠুর আঘাতে শোণিতসিক্ত হ'য়েছে।

পাগলের কাণ্ড

প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া এই অমৃতময়ী উপদেশ বাণী চলিতে লাগিল। মানুষ ভুলিয়া গেল যে তাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে বা পোনরা গ্রামে সমবেত হইয়াছে। দেশ-কাল-পাত্রের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের প্রাণে শুধু এই একটি বাণী নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে জাগিতে লাগিল,—"চাই আত্মবলিদান।" শ্রোতা-দের মুখে চখে এক অত্যাশ্চর্য্য দীপ্তির প্রকাশ পাইল। শ্রোতাদের মধ্যে একটি অর্দ্ধোন্মাদ-ভাবগ্রস্থ ব্যক্তি ছিল। বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে সে

হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া বক্তৃতা-মঞ্চের উপরে দাঁড়াইল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল,—"এখনি আমি আত্মবলি দিব, আর একটি নিমেষও দেরী করিব না।" শ্রোতারা তাহাকে উঠিয়া থামাইয়া দিলেন এবং তৎপরে বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

বক্তৃতান্তে ঘরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাগলকে শুধুই পাগল ব'লো না। তোমাদের প্রত্যেক্‌কে এরূপ পাগল করার জন্যই না আমি এতক্ষণ কথা বল্‌ছিলাম। আমার আফ্‌শোষ এই যে, তোমরা প্রত্যেকে এসে বল্‌তে বাধ্য হ'লে না,—"আমরাও আত্মবলি দিব, আর সবুর সইব না।"

কাঁশারিখোলা

১লা পৌষ মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা স্বগণ-সহ কাঁশারিখোলা শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস মজুমদারের বাড়ী রওনা হইলেন। গ্রামবাসিগণ প্রায় দেড় মাইল দূর হইতে "হরি ওঁ" কীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিলেন। বেলা নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবার মৌনব্রত আরম্ভ হইবার কথা। গ্রামে প্রবেশের পূর্ব্বেই নয়টা বাজিয়া গেল। সুতারাং মধ্যপথেই তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন এবং রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত মৌনী রহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার শুভাগমনে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উৎসাহ-বহ্নি যেন দাবানলের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইল। পার্থক্য এই রহিল যে, দাবানলে জ্বালা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু প্রেমের এই অনলে মানব-মনের সকল জ্বালার শান্তি হইতে লাগিল। গ্রামের মধ্য দিয়া আসিবার কালে প্রতি গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কুমারীগণ শ্রীশ্রীবাবার কণ্ঠদেশে মাল্যার্পণ

ও চরণে পুষ্পাঞ্জলি স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং জননীগণ শত কণ্ঠে উলুধ্বনি দিতে লাগিলেন।

মৌনের কারণ

শ্রীশ্রীবাবা মৌনী বলিয়া অন্য কেহ তাঁহাকে কোনও উদ্বেগ প্রদান করিলেন না। কিন্তু পল্লীবাসী একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক এক ফাঁকে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

উত্তরস্বরূপে শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়া দিলেন,—"একদল লোক পথ-নির্দ্দেশ চায়, কিন্তু সে পথে চলে না। আর একদল লোক প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তরের প্রতি কাণ দেয় না। কোনো কোনো লোক শুধু পাঠ করে, কিন্তু অর্থগ্রহের চেষ্টা করে না। কোনো কোনো লোক কেবল কথা বলে, বক্তৃতা দেয় বা প্রবন্ধ লেখে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই বুঝাইয়া দেয়না। একদল লোক কেবলই গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে, কিন্তু অপরকে তাহার ফল-বণ্টন করে না। একদল লোক মৌনী থাকিয়া ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চয় করে এবং জগৎকল্যাণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে তার একটি কণাও ব্যয় করে না। আমি এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক হইতে ভালবাসি।"

২রা পৌষ বুধবার প্রাতে আট ঘটিকায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। এখানকার উপাসনা পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান সমূহের উপাসনা অপেক্ষাও যেন জমাট বাঁধিল। সমাগত সর্ব্বজাতীয় নারী-পুরুষ মিলিত কণ্ঠে অখণ্ড-স্তোত্র পাঠ করিয়া প্রণব বিগ্রহে অঞ্জলির পুষ্প-তুলসী, বিল্বপত্র অর্পণ করিলেন এবং মহানন্দে খৈয়ের মোয়া ও নারিকেলের নাড়ু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আদর্শ দম্পতী

উপাসনান্তে কতিপয় ব্যাকুল দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল। একজন মহি-

দার স্বামী গতকল্য পোনরাতে দীক্ষা নিয়াছেন, অগ্ধ তিনি তার পত্নীকে দীক্ষার জন্য এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই আগ্রহের কারণ অনু-সন্ধানে জানা গেল যে, দীক্ষার পরমুহূর্ত্ত হইতেই নিজের আভ্যন্তরীণ অসহায়-অসহায় ভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে অনুভব করিয়া স্বামীটী প্রাণভরা বলের ও বুকভরা সাহসের সঞ্চার বোধ করিতেছেন। অতএব তিনি তাঁহার জীবন-পথের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকেও এই বল ও সাহসের অংশ নিবার জন্য আগ্রহান্বিতা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—স্বামী টানবেন স্ত্রীকে সৎপথে আর স্ত্রী টান্‌বেন স্বামীকে সৎপথে, এই হচ্ছে আদর্শ দাম্পত্য-জীবন। একে অপরকে দুর্ব্বলতার পথে টেনে আনে ব'লেই না দাম্পত্য সম্পর্কটা একটা পাপাচারের কারখানায় পরিণত হয়েছে। তোমরা ধন্য যে একজন আর এক জনকে সৎপথে টান্‌ছ।

ভ্রূমধ্যবিহারী শ্রীভগবান্

অদ্যকার দীক্ষার্থীদের মধ্যে একজন অন্ধ। তাহাকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দেননি ব'লে তুমি কখনো তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রো না। জানবে, দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে তিনি তোমাকে জগতের বারো আনা প্রলোভনের বাইরে রেখেছেন। এখন তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার জ্ঞানের চক্ষু উন্মীলন কত্তে চেষ্টা কর। সেই চক্ষু খোলে ভ্রূমধ্যে নিত্যকাল ভগবানের মঙ্গলময় উপস্থিতির চিন্তনে। জানো, তিনি পরম করুণাময়, তিনি নিখিল আনন্দের কন্দ, তিনি সর্ব্ব সুখের আকর, তিনি রসময়, প্রেমময়, ক্ষেমময়। তিনি একটী নিমেষের জন্যও তোমাকে পরিত্যাগ করেন না। প্রজ্ঞারূপে, অভয়রূপে, সান্ত্বনা-রূপে নিয়ত তিনি তোমার ভ্রূমধ্যে বিরাজ করেন। একটী মুহূর্ত্তের জন্যও

তিনি তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে যান না। ভ্রূমধ্য-বিহারী শ্রীভগবান্‌কে সকল বোধশক্তি দিয়ে অনুক্ষণ বিরাজমান ব'লে অনুভব করার চেষ্টা কর। এতেই তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে।

দীক্ষা ও জগন্মঙ্গল

দীক্ষাদানকালে শ্রীশ্রীবাবা প্রত্যেককে বলিলেন,- তোমার এই দীক্ষা একাকী তোমার কুশলের জন্য নয়, তোমার সাথে সাথে নিখিল জগতের প্রত্যেকটী মানব-মানবী, প্রত্যেকটী প্রাণী, প্রত্যেকটী অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত কুশলবন্ত হবে, তারই জন্য আজ তুমি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছ। "একলা আমি মুক্ত হ'তে চাই না প্রাণনাথ, আমায় তুমি যুক্ত কর বিশ্বজনার সাথ",—এই হবে তোমার মূল মন্ত্র। তারই জন্য তুমি আমার নিকটে দীক্ষিত হচ্ছ। একমাত্র নিজের উদ্ধারের জন্য নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধারের জন্য তোমার এ সাধন-গ্রহণ। তোমার মুক্তির সাথে সাথে নিখিল বিশ্বের মুক্তি সাধিত হবে, এরই জন্য আজ হ'তে তোমার সংজ্ঞা হবে অখণ্ড। তোমার লক্ষ্য, তোমার আদর্শ কখনো তোমার ব্যক্তিগত উদ্ধারের চিন্তা-দ্বারা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে নিয়ে পরমানন্দের লীলা তোমরা করবে। ভেদাভেদ বিস্মৃত হ'য়ে, উচ্চনীচের পার্থক্য বিদূরিত ক'রে দিয়ে, সকল অজ্ঞ, অন্ধ, পঙ্গু জীবের পূর্ণ নিষ্কৃতির পথ তোমারই একাগ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ সাধনের ফলে নির্গত হবে। এই কথাটি কখনো ভুলে যাবে না। "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং" —আমি জগতের কল্যাণকারী, এইটীই তোমাদের আদর্শ, জানবে।

দীক্ষারূপ নবজন্মলাভ ব্যর্থ হইতে দিও না

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কখনো ভুলে যেওনা যে, দীক্ষালাভ

প্রকৃত প্রস্তাবে নবজন্ম লাভ। এই নবজন্ম লাভ ক'রে ভগবৎ-প্রেমময় নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ জীবন যাপনের জন্য তোমারা বদ্ধপরিকর হও। কত-বার কত জীবের গৃহে কতরূপ জন্ম গ্রহণ করেছ। অসাধনে সব জন্মই বৃথা হয়েছে। এমন কি মানব-গৃহে মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করার পরেও এতদিন এই জন্মকে সার্থক করার জন্য কিছুই কর নাই। আজ যখন দীক্ষাযোগে নূতন জন্ম তোমাদের হল, তখন এই নূতন জন্মগ্রহণ যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্য কঠোর-সঙ্কল্প-সম্পন্ন হও। হেলায়, খেলায়, ঔদাসিন্যে অতীতে বহু সময় ক্ষেপণ করেছ, আজ থেকে সঙ্কল্প কর যে, প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে কাজে এনে ছাড়্‌বে। কামারের ভস্ত্রাও বৃথা কাজ করে না, আর তোমার ফুস্‌ফুস্‌টাই কি কেবল বৃথা শ্রম কর্ব্বে? প্রতি শ্বাসে প্রতি প্রশ্বাসে ইষ্টনাম স্মরণ ক'রে এদের সার্থকতা লাভের সুযোগ দাও।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে ধর্ম্মসভার কার্য্যারম্ভ হইল। সর্ব্বত্রই শ্রীশ্রীবাবা সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন, এখানেও তিনিই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। তবে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন প্রথমে সভাপতি-নির্ব্বাচন ও অপর একজন সমর্থন করার পরে কার্য্য আরম্ভ হইল। ধামতী এবং কাঁশরি খোলার পক্ষ হইতে দুইখানা সুলিখিত অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল।

তৎপরে আমাদের একজন-গুরু ভ্রাতা একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দানের দ্বারা ভারতের অতীত মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ভারত কি ভাবে জগতে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায়, অতুলনীয় ভাব-

সম্পদ-সমৃদ্ধ বাণী প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রায় দুইঘণ্টাকাল জন-মণ্ডলী নিঃশব্দে নিঃস্পন্দ চিত্রার্পিতবৎ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই হাজার পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু মনে হইতে লাগিল, যেন সকলে মিলিয়া একটী কলেবরে পরিণত হইয়া গিয়াছেন এবং একজনের বক্তৃতা মাত্র একটী ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন।

অতীতের মানবতার দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীতে ভারত জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত উন্নত ছিলেন, সেই কথা যদি ভুলেও যাও, তবু তোমরা অতীতের ভারত মানব-জীবনের কর্ত্তব্য পালনের যে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ রেখে গেছেন, তা' ভুলে যেও না। ভুলে যেও না, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসী, ভ্রাতৃসেবা-ব্রত পালনের জন্য লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য পালনে কৃতধী, স্বামিভক্তির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সীতা নির্ব্বাসনেও অবিচলিতা। ভুলে যেও না, ভীষ্ম পিতৃসুখের জন্য রাজ্যত্যাগী ও অকৃতদার, একলব্য গুরুর আদেশ পালনের জন্য স্বকীয় অঙ্গুষ্ঠ-চ্ছেদনকারী, কর্ণ অতিথি সেবার জন্য পুত্র-বিরহেও অকাতর। অতীত ভারতের এই আদর্শ-জীবন পুনরায় ভারতে আত্মপ্রকাশ করুক। অতীতের চরিত্র-মহিমা নূতন ক'রে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হ'য়ে জগৎকে ডেকে বলুক,—এই দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দেখে শিক্ষার্জ্জন কর যে, মানব-জীবনের সমস্যাসঙ্কুল কুটিল পথ-বিভ্রান্তিতে সমাধানের পথ কোথায় এবং কোন্ দিকে?

চরিত্র-মহিমার অনুশীলন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সভ্য জাতি মাত্রেরই

কাম্য। কিন্তু শুধু জ্ঞানে আর বিজ্ঞানে উন্নত হ'লেই আমাদের সব-কিছু হ'ল না। এক সহস্র দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ মহাগ্রন্থ অধ্যয়নের চেয়েও একবিন্দু চরিত্রবলের মর্য্যাদা অধিক। দিগেদশব্যাপী বিজয়-বাহিনী পরিচালনা ক'রে চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীশ্বর হওয়ার চাইতেও এককণা চরিত্রবলের মূল্য বেশী। সেইরূপ চরিত্র মর্য্যাদায়-মর্য্যাদাবান্ এবং চরিত্র-সম্পদে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ এই ভারতকে গড়ে তোলার জন্যই আমাদের সকল চেষ্টা, সকল অধ্যবসায়। যাতে তেমন ভবিষ্যৎ আমরা গড়্‌তে পারি, তারই জন্য আজ অতীতের চরিত্র-মহিমার অনুধাবন এবং পুনরনুশীলন আবশ্যক।

ভবিষ্যতের জন্যই অতীত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিমেষের জন্যও তোমরা কেউ ভেব না যে, ভারত চিরকাল পর-পদানত থাক্‌বে। ক্ষণকালের জন্যও এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে চিত্তে ঠাঁই দিও না যে, চিরকাল তোমরা আদর্শ-ভ্রষ্ট এবং পথ-বিচ্যুত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে। ভারত-গগনের চিরতমসাবৃত অমানিশার অবসান সুনিশ্চিত এবং অদূরে। কিন্তু তার জন্য চাই তোমাদের আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবা এবং চরিত্রবল। তার জন্য চাই তোমাদের লক্ষ্যের সুস্পষ্টতা। তার জন্য চাই তোমাদের দ্বিধাবৰ্জ্জিত, আড়ষ্টতাবিহীন কুণ্ঠামুক্ত সবল বাহু-বিস্তার। এ কাজ দুর্ব্বলের নয়, লক্ষ্যহীনের নয়, আদর্শ-বঞ্চিতের নয়, কুণ্ঠা-কাতর অল্প-প্রাণের নয়। একাজ শক্তিমানের, লক্ষ্যযুক্তের, আদর্শনিষ্ঠের। তাই আজ ভবিষ্য পানে বিদ্যুদ্‌গতিতে চলার পথে মাঝে মাঝে একটু থেমে অতীতের দৃষ্টান্তের, অতীতের মানবতার আদর্শের, অতীতের চরিত্রগঠনের ধারার প্রতি তীক্ষ্ণ ও মৰ্ম্মভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ্‌তে হবে। ভবিষ্যৎকে গড়ার জন্যই অতীত

আমাদের আবশ্যক। অতীত শুধুই মৃত-কঙ্কাল নয়, অতীত শুধুই শব-শোভা-যাত্রা নয়, অতীত শুধুই শ্মশানের দীর্ঘশ্বাস নয়। অতীতেরও অবিনশ্বর প্রাণ আছে এবং সেই প্রাণ অনন্ত ভবিষ্যতের দিকেই প্রসারিত।

প্রাচীন ভারত পুনরাবির্ভূত হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীতকে ভবিষ্যতের মধ্যে আমরা পুনর্জ্জীবন্ত ক'রে তুলব, অতীতের জীবন-স্পন্দনকে আমরা ভবিষ্যতের মধ্য দিয়েই পুনরাবিষ্কার কর্ব্ব, অতীতের মহনীয় গৌরবকে আমরা নূতন ক'রে ভবিষ্যতের মাঝে আস্বাদন কর্ব্ব। এই জন্যই না আমরা আজ বর্ত্তমান! এই জন্যই না আমরা আজ দণ্ডায়মান! অতীতের শাশ্বত সত্যকে ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে নবজন্ম দেবার ক্ষমতা যদি আমাদের না হয়, তবে আমাদের নরবপু নিয়ে জন্ম লাভের গর্ব্ব করা বৃথা। এস আজ তারস্বরে ডেকে বলি,—হে মহি মান্বিত অতীত ভারত, হে সৌরভ-মহীয়ান্ প্রাচীন ভারত, হে গৌরবসমুজ্জ্বল বিগত ভারত, পুনরায় তুমি নূতন ক'রে নূতন জগতের নূতনতর পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের পরিপূর্ণ বিভায়, পরিপূর্ণ দীপ্তিতে, পরিপূর্ণ প্রতিভায় আবির্ভূত হও। এস আজ প্রাণ খুলে ডেকে বলি,—হে আমার শাশত ভারত-সভ্যতা, বিশ্বমৈত্রীর সিংহাসনে রাজ-সমারোহে উপবেশন ক'রে বিশ্বকে ধন্য করার জন্য পুনরাবির্ভূত হও। এস আজ মেঘমন্দ্রে কোটি কণ্ঠে আবাহনী গীতি গাই,—

এস হে অতীত, চির পুরাতন, *

চির নূতনের বেশে,

---

* বক্তৃতা-কালে অত্যন্ত আবেগের সময়ে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ হইতে সদ্যোরচিত কবিতাসমূহ প্রায়ই নির্গত হইতে দেখা যায়।

স্বেচ্ছাবরিত এস হে দুঃখ
তৃপ্তির হাসি হেসে,
পরের লাগিয়া কৃচ্ছ্র-বরণ,
বিশ্বের তরে হৃদি-বিদারণ,
নিজেরে দানিতে শত শত বার
জীবহিতে নিঃশেষে,
এস হে প্রবীণ প্রাচীন জীবন
নবীনের নব দেশে।

শুভপুর

৩রা পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কাঁশারীখোলা ত্যাগ করিলেন। শুভপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পালের গৃহে পৌছিতে এক ঘণ্টা সময় লাগিল। "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তবে, এই গ্রামে পূর্ব্বে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনের চর্চ্চা না থাকায় অনভ্যস্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন ভালভাবে জমিল না।

হরি-ওঁ কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হরি-ওঁ কীর্ত্তনকে তোমরা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের কীর্ত্তন ব'লে জান্‌বে। সাকার-বাদী, নিরাকার-বাদী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি কারো এই নাম কীর্ত্তনে আপত্তি কর্ব্বার কিছু নেই বা থাক্‌তে পারে না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের ধর্ম্মমত বা তত্ত্বের পূর্ণ সমর্থন এতে আছে। 'হরি' শব্দের মানে হচ্ছে, ইনি সব কিছুকে একত্র আহরণ করেন, মতভেদ পথভেদ প্রভৃতির

কলহ এঁরই ভিতরে এসে মিটে যায়। 'হরি-ওঁ' কথার মানে হচ্ছে ওঙ্কারই হচ্ছেন সেই সর্ব্বমন্ত্রের, সর্ব্বতন্ত্রের, সর্ব্বতত্ত্বের, সর্ব্বমতের, সর্ব্বপথের, সর্ব্বসত্যের আহরণকারী পরমবস্তু।

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, সবাই মিলে তোরা প্রাণ ভ'রে মন ভ'রে হরি-ওঁ কীর্ত্তন কর্; বেদে, প্রণবে, পরমতত্ত্বে তোদের যে সকলের পূর্ণ অধিকার, তা তোরা নিজেরা নিজেদের কণ্ঠে প্রচার কর্।) তোরা তোদের শাশ্বত অধিকার প্রতিষ্ঠা কর্। সবাই যে তোরা এক, একথা আজ সর্ব্বসমন্বয়ী এই মহাকীর্ত্তনের ধ্বনির ঐক্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত কর্। ব্রাহ্মণেরাই নাকি তোদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আজ পুরুষানুক্রমিক তপস্যায় পবিত্র ব্রাহ্মণের গৃহে জাত এই শরীর নিয়ে আবির্ভূত হ'য়ে আমি তোদের নিকটে প্রসারিত করে সেই অধিকারই বিলিয়ে দিচ্ছি। কৃপণ হস্তের কুণ্ঠিত দান এ নয়। আমি আজ খোলা প্রাণে খোলা মনে যেমন এ অধিকার তোদের বিতরণ কচ্ছি, তোরা আজ তেমনি নিঃশঙ্ক চিত্তে দ্বিধাহীন প্রাণে সে অধিকার গ্রহণ কর্। সাম্প্রদায়িক তুচ্ছ ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িক কলহ-কচায়ন সব তোরা ভুলে যা, ছোট-বড়'র পার্থক্য ভুলে, উচ্চ-নীচের দূরত্ব ভুলে সবাই এসে কোলাকুলি ক'রে পরস্পরের কাছে দাঁড়া, আর মেঘমন্দ্রে কীর্ত্তন-ধ্বনি উত্থিত ক'রে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোল্,—"হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

শ্রীশ্রীবাবার বাণীতে প্রবুদ্ধ হইয়া গ্রামবাসীরা উৎসাহ-সহকারে হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ওঙ্কারই শান্তি-স্বরূপ

এই গ্রামে কয়েকজন মহিলা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহাদের স্বামীরা পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপাসনার শেষে বল্‌বে "ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।" তারপরে মঙ্গলময় মহামন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে আসন ত্যাগ করবে। "ওঁ শান্তিঃ" কথাটুকুর মানে যে কি, তা কখনো স্মরণ রাখ্‌তে ভুলো না। হে ওঙ্কার, হে অখণ্ড মন্ত্র, হে মন্ত্ররাজ প্রণব, তুমিই হচ্ছ সকল শান্তির মূলাধার, তুমিই হচ্ছ সকল শান্তির আকর, তুমি হচ্ছ শান্তি-স্বরূপ,—এই হচ্ছে "ওঁ শান্তিঃ" কথাটুকুর মানে।

অর্থ বুঝিয়া মন্ত্রপাঠ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপাসনার প্রত্যেকটী মন্ত্রের মানে বুঝবার চেষ্টা কর্‌বে। নিজেরা লিখ্‌তে পড়্‌তে না জান ত' নিজ নিজ স্বামী বা অপর কোনও শিক্ষিত গুরুভ্রাতা বা গুরুভগ্নীর নিকট থেকে মানে জেনে এবং বুঝে নেবে। ভোজ্যবস্তুর নিজস্ব শক্তি আছে, তবু নুন-মশলা না দিলে তা বিস্বাদ হয়, অরুচিকর হয়। আর, তা দিলে সুস্বাদ হয়, তৃপ্তিকর হয়। মন্ত্রের নিজস্ব শক্তি আছে, না বুঝেও যদি তা উচ্চারণ কর, তবে তার শক্তি সে এক সময়ে না এক সময়ে প্রকাশ কর্ব্বেই কর্ব্বে। কিন্তু অর্থ বুঝে যদি উচ্চারণ কর, তবে তার স্বাদ পাবে কত, তাতে তৃপ্তি হবে কত। এ জন্যই, শিক্ষিতা হও আর অশিক্ষিতা হও, মন্ত্রগুলির অর্থ শিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বে সর্ব্বপ্রথমে।

মন্ত্রার্থ-স্মরণ ও শাস্ত্রপাঠ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্তরের ভাব-পরিপুষ্টির জন্যই লোকে শাস্ত্রপাঠ

করে। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের উপাসনার স্তোত্রগুলি অর্থ বুঝে বুঝে বারংবার পাঠ কর, তাহ'লে দেখ্‌বে, সর্ব্বশাস্ত্রের প্রগাঢ়তম তত্ত্বগুলি এরই ভিতর থেকে বের হ'য়ে এসে তোমাদের অনুভূতির মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। এই কয়েকটা মন্ত্রের মধ্য দিয়েই সর্ব্বশাস্ত্রের সার এবং মহিমা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা উপাসনার সবগুলি মন্ত্রের পূর্ণ অর্থ বুঝ্‌বার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা কর্ব্বে।

ভিতরের বক্তৃতা শোন

ইহার পরে গ্রামবাসী সকলেই শ্রীশ্রীবাবাকে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মনের গভীর অভিনিবেশ দিয়ে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন শোন, আর প্রাণের পূর্ণ ব্যাকুলতা নিয়ে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন কর। হট্টগোলের ভাব পরিহার ক'রে প্রেম ও ধ্যানাবেশ নিয়ে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন শোন আর শুনাও। এর চেয়ে আর বড় বক্তৃতা কিসে হবে? নামে মজ, আর নামের মত্ততায় জগৎ ডুবাও। জগতের সকল বক্তৃতা হরি-নামের ভিতরে লুকিয়ে আছে। বাইরের বক্তৃতা শুনে আর কি হবে? ভিতরের বক্তৃতা শোন।

আর সময়ও ছিল না, ক্রমশঃ বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা নবীয়াবাদ্ রওনা হইলেন।

নবীয়াবাদ

বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নবীয়াবাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পোদ্দারের বাড়ী পৌঁছিলেন। গ্রামবাসিগণ প্রায় এক মাইল দূর হইতে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া

আনিলেন। কিন্তু বেলা দশটাতেই শ্রীশ্রীবাবার মৌনারম্ভ হইয়াছে এবং অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় মৌনভঙ্গ হইল।

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় ধর্ম্মসভা সুরু হইল। বেলাসর-অখণ্ডমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রীতিরঞ্জন অখণ্ড একটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন।

ভক্ত দাদা

প্রথমে নোয়াখালীর অন্তর্গত মাধবসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকী নাথ গুপ্ত এবং আমাদের অপর একভ্রাতা বক্তৃতা করিলেন। জানকী নাথ অদ্যই বেলা দশটার সময়ে নবীয়াবাদ পৌছিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি পরমহংস মহারাজের শিষ্য। কিন্তু তিনি শ্রীশ্রী-বাবার আদর্শ ও জীবনের প্রতি সুগভীর অনুরাগী ও একান্ত মুগ্ধ ভক্ত। এই জন্য আমরা তাঁহাকে "ভক্ত দাদা" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। নিরভি-মান, নিরহঙ্কার, অনুগত ও উচ্চ-চিন্তাপরায়ণ এই সুবক্তা মহোদয় যৌবনে স্বর্গীয় বিপিন চন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বাগ্মী ও দেশকর্ম্মীদের নিত্যসেবক তথা নিত্য-সঙ্গী ছিলেন। ফলে এই সকল মহামানবের চিন্তার প্রভাব ভক্তদাদার উপরে প্রবল ভাবে পড়িয়াছে। কিন্তু বক্তৃতাকালে বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ বিপিন চন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্টই ইঁহার উপরে লক্ষ্য করা যায়।

বক্তৃতা করিতে করিতে প্রসঙ্গ ক্রমে ভক্তদাদা বলিলেন,—কত কত প্রতিষ্ঠাবান্ বক্তারা সহরে বন্দরে যাইয়া বক্তৃতা দিয়া বাগ্মিতার খ্যাতি কুড়াইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার তুল্য ধর্ম্মবক্তা বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার বাগ্মিতার প্রসাদগুণ ও প্রতিভার বহুমুখিন-তার জন্য তাঁহার সহিত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যেও অতি অল্পেরই

তুলনা হইয়া থাকে, যাঁহার বাণী এবং জীবন পরস্পর হইতে অভিন্ন বলিয়া সহজেই শ্রোতার মর্ম্মভেদ করে, আজ তাঁহার পক্ষে সহর-বন্দর উপেক্ষা করিয়া অনাদৃত পল্লী-সমূহে আগমন করিবার কারণ কি, তাহা কি আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

ইতঃপূর্ব্বে এস্থানের কেহই শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত-ভাষণ শ্রবণ করেন নাই, তাই প্রথমেই ভক্তদাদার মুখে এতজ্জাতীয় কথা শুনিয়া কেহ কেহ ভাবিলেন, কথাগুলিতে কি অত্যুক্তি হইতেছে না?

কেহই তোমার শত্রু নহে

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা যখন তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিলেন, তখন সত্য সত্যই শ্রোতৃমণ্ডলীর গভীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে মধুর বক্তৃতা হইল, বোধ হয় বনের প্রাণীও ইহাতে বিগলিত না হইয়া পারিত না। সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। স্থানীয় একজন অতি বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—"সহরে বা গ্রামে এইরূপ বক্তৃতা জীবনে কখনও শুনিব, এইরূপ প্রত্যাশার ছন্দাংশও আমাদের মনে ছিল না।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শত্রু ভেবে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন কর, শত্রু জ্ঞানে একে অন্যের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হও, কিন্তু জগতে যে তোমার শত্রু কেউ নেই, থাক্‌তে পারে না, এই পরম সত্যকে জান্‌বার চেষ্টা কর না। কে বলে মানুষ মানুষের শত্রু, সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের শত্রু, জাতি জাতির শত্রু? অন্তরের ভিতরে শত্রুর দলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ, তাই জগৎ জুড়ে শুধু শত্রুই দেখ, তাই সকল মিত্রকে তোমরা অ-মিত্রে পরিণত কর। সর্ব্বপ্রযত্নে অন্তরের শত্রুকে বিনাশ কর, প্রকৃত শত্রুক্ষয়ী হও।

প্রকৃত শত্রু কোথায় ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরে যাদের শত্রু ব'লে ভ্রম কর, তারা তোমার শত্রু নয়। শত্রু আছে লুকিয়ে তোমার মনের ভিতরে গোপনে, দুর্ব্বলতা রূপে, কাপুরুষতা রূপে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনিচ্ছারূপে, মৃত্যুভয় রূপে। সেই শত্রুকে জয় কর, সেই শত্রুকে অতি দ্রুত শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। শান্তি তাতে, তৃপ্তি তাতে, আনন্দ তাতে।

অন্তর্জ্জগৎ বনাম বহির্জ্জগৎ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার অন্তর্জ্জগতের শত্রুরাই বহির্জ্জগতে গিয়ে শত্রুর রূপ নেয়,—তারা ছায়া মাত্র, কায়া নয়,—তারা প্রতিবিম্ব মাত্র, বিগ্রহ নয়,—তারা শাখা মাত্র, মূল নয়। মূলকে আগে ধ্বংস কর, কায়াকে আগে নাশ কর, শাখা আর ছায়া, প্রতিবিম্ব আর প্রতিচ্ছবি আপনি ধূলিতে লুণ্ঠিত হবে। তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদিনী দৃষ্টি দিয়ে নিজের অন্তরের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ কর, গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে রূপান্তর পরিগ্রহ ক'রে ভাবান্তরের আবরণে যেখানে যে অসত্য আছে, অধর্ম্ম আছে, দুর্ব্বলতা আছে, যেখানে যে মিথ্যার সাথে আপোষ আছে, নীচতার প্রতি প্রশ্রয় আছে, দুর্ম্মতির প্রতি আসক্তি আছে, সবল হস্ত-প্রসারণে তাকে ধ্বংশ কর। অন্তরে তুমি দুর্ব্বল ব'লেই বাইরের দস্যু বেপরোয়া। অন্তরে তুমি ভণ্ড ব'লেই বাইরের অসত্যাচারী নির্ভীক। অন্তর্জ্জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধকে সত্য ব'লে স্বীকার কর।

বহির্জ্জগতের অন্যায়ের প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বহির্জ্জগতে যারা দুর্ব্বৃত্ত, যারা পরস্বাপহরণ-

কারী, যারা পরপীড়নকারী, বহির্জ্জগতে যারা উৎপীড়ক, অত্যাচারী, মর্য্যাদা-নাশকারী, বহির্জ্জগতে যারা নিরীহের শান্তিভঙ্গকারী, শান্তি-প্রিয়ের আতঙ্কবর্দ্ধক, তপঃপ্রিয়ের তপস্যা-বিঘাতক, তাদের প্রতি কি তবে তোমার করণীয় কিছুই নেই? ধর্ম্মস্থান অপবিত্র হবে, বাসগৃহ অগ্নিদগ্ধ হবে, নারীকুলের সম্ভ্রম ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে, আর তুমি কি কেবলি আত্ম-শাসন কর্ব্বে আর আত্মশোধন কর্ব্বে? অন্তরেরই পাপ বাইরের যে উৎপীড়ন এনে দিয়েছে, তার প্রতীকার কি কেবলি অন্তরের শুদ্ধি-সম্পাদনের দ্বারা হবে? বাইরের পাপকে, বাইরের অন্যায়কে একটী অঙ্গুলীহেলনেও কি প্রতিবাদ জানাবে না? জানাবে। শুধু প্রতিবাদই জানিয়ে তুমি ক্ষান্ত থাক্‌বে না, প্রতিকারও তার কর্ব্বে। সেই প্রতী-কারের প্রকৃত পন্থা যতই কঠোর, যতই রুদ্র হোক্, তাকেই অবলম্বন কত্তে হবে। কিন্তু প্রতিহিংসার বশে নয়। যে সন্তান মাতৃস্তনে দংশন করে, মাতা কি তাকে শাসন করেন না? কিন্তু সেই শাসনে প্রতিহিংসা নেই, আছে সন্তানের দুর্ব্বৃত্ততা প্রশমনের সাত্ত্বিক পবিত্র আকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাতে অভিসম্পাত নেই, অমঙ্গলেচ্ছা নেই। সন্তানও মাতৃস্তন-দংশনের কুবৃত্তি পরিহার কর্ল্ল, মাও সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মুখখানা টেনে এনে সেই স্তনের গায়েই লাগালেন!

ধর্ম্ম বনাম প্রতিহিংসা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার ধর্ম্ম ও তোমার ধর্ম্ম-বোধ প্রতি-হিংসাকে অন্যায়ের প্রতীকারের পন্থা রূপে গ্রহণ কত্তে তোমাকে বাধা দেবে। প্রতিহিংসা দুর্ব্বলেরই স্বভাব, প্রতিহিংসা বর্ব্বরেরই প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম মানুষকে সবল করে, সুসভ্য করে। যার ধর্ম্ম আছে, সে দুর্ব্বলের

প্রকৃতি, বর্ব্বরের আচরণ অনুকরণ কত্তে পারে না। ধর্ম্ম কেবল তোমাকে ধারণই করে না, আদর্শবাদের চূড়ান্ত উচ্চতায়, চরম উৎকর্ষে তোমাকে অধিষ্ঠিত করে। ধর্ম্ম কেবল তোমাকে সুসভ্যই করে না, জগতে যত জন, যত প্রাণী তোমার সংস্পর্শে আসে, তাদের প্রত্যেককে সুসভ্য করে। এজন্যই ধর্ম্মের এত মান, ধর্ম্মের এত মহিমা। তারই জন্য ধর্ম্ম তোমাকে প্রতিহিংসার পথে পরিচালিত হতে দেবে না, দিতে পারে না।

ধর্ম্ম ও ক্লৈব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্মের নামে জগতে ক্লৈব্যেরও অনুশীলন কম ত'হয় নি! ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে উড়িয়ে জগতের মানুষ কম কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নি! ধর্ম্মানুসরণের আত্ম-প্রবঞ্চনায় কত বীর্য্যবান্ নপুংসকত্ব অর্জ্জন করেছে, কত ধীমান্ মনীষী হস্তিমূর্খের ন্যায় আচরণ করেছে, কত কৃতিত্বশালী সুধন্য পুরুষের জীবন অন্ধজনোচিত দৃষ্টি-দৈন্যে এবং বালকোচিত লক্ষ্যহীনতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই, যাতে ধর্ম্মের নামে নিষ্ফল ভাবপ্রবণতা এসে নিষ্কাম কর্ত্তব্য সম্পাদনের পথে বৃথা দুর্ব্বলতা সৃষ্টি না করে, একমাত্র তারই জন্য নিজ অন্তরের ভিতরের শত্রুর কায়াকে বিনাশের সাথে সাথে সেই শত্রুর বাইরের ছায়াকেও বিনষ্ট করার অনুশীলন কত্তে হবে। জগৎ থেকে শত্রুকে দূর করার জন্য এই অনুশীলন নয়, এই অনুশীলনের প্রয়োজন তোমার অন্তরের ক্লৈব্যকে দূর করার জন্য।

প্রতি কর্ম্মে আধ্যাত্মিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কখনো তুমি ভুলতে পার না যে, অন্তরে বাহিরে তোমার প্রত্যেকটী কার্য্য, প্রত্যেকটী স্পন্দন, প্রত্যেকটী আবেগ,

প্রত্যেকটী উদ্যম হবে দেবতার, হবে প্রবুদ্ধাত্মা ঋষির, হবে জগদুদ্ধারকারী মহামানবের, হবে পরমপ্রেমিক আদর্শদাতা পরিত্রাতার। জগৎকে শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ এবং পূর্ণতা বিতরণেরই জন্য পূর্ণতাস্বরূপ পরমাত্মার কাছ থেকে তুমি এই অপূর্ণ ধরিত্রীর উচ্চাবচ বক্ষে ছুটে এসেছ। তোমার চিন্তায়, তোমার বাক্যে, তোমার আচরণে সবই হবে মধুময়, প্রেমময়, সুখময়। এ মধু নিত্যমধু, এ প্রেম নিত্যপ্রেম, এ সুখ নিত্য-সুখ। নিত্যানন্দধামের পানে জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীকে আকৃষ্ট করাই তোমার প্রথম সাধনা, প্রধান সাধনা, মুখ্য সাধনা। তোমার আত্মশাসন তারই জন্য, তোমার বহির্জ্জগতের যাবতীয় অন্যায়ের প্রতীকার-চেষ্টা তারই জন্য। বাহ্য এবং আভ্যন্তর প্রত্যেকটী কর্ম্মে এই আধ্যাত্মি-কতাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

ধন্য হোক্—মনুষ্য-জীবন

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা সদ্যোরচিত কবিতায় বলিলেন,—

চন্দ্রসূর্য্য তারকাদি
যত ঊর্দ্ধে করে বিচরণ,
নিজ জীবনের লক্ষ্য
তারো ঊর্দ্ধে করহ স্থাপন;
নির্ভীক উদ্যমে চল,—
সুনির্ম্মল ক্লেদহীন মন
নিখিল দ্বন্দ্বের মাঝে
নবসৃষ্টি করুক রচন;

সর্ব্বজাতি সর্ব্ববর্ণ
ভেদবুদ্ধি হোক্ বিস্মরণ,
এক মিলনের মন্ত্র
সর্ব্বধর্ম্মে করুক রমণ,
সমচিত্তে সমপ্রাণে
দশদিশি করি' সঞ্চরণ
মৃত্যুময় পৃথ্বীমাঝে
বরষুক মৃত-সঞ্জীবন;
নিমীলিত নয়নের
জ্যোতির্ম্ময় হোক্ উন্মীলন,
বিবশ রসনা-কোণে
দিব্য রস হোক্ আস্বাদন,
বিচিত্র ভিন্নতা-মাঝে
এক সত্য হোক্ উদ্‌ঘাটন,
দেবত্বের পূর্ণতায়
ধন্য হোক্ মনুষ্য-জীবন।

বক্তা কি যে বাণী কহিলেন, আর শ্রোতারা কি যে বাণী শুনিলেন, তাহা লিখিবার ক্ষমতা কোথায়? প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে সভা-ভঙ্গ হইল।

সমবেত উপাসনা ও সূক্ষ্ম উপস্থিতি

৪ঠা পৌষ, শুক্রবার প্রাতে নবীয়াবাদে সমবেত উপাসনা হইল। শ্রীশ্রীবাবা নিজে উপাসনা পরিচালন না করিয়া ব্রহ্মচারী ইন্দুদাকে

উপাসনা পরিচালনের আদেশ দিলেন। বলিলেন,—উপাসনা যেই যেখানে পরিচালন করুক, জানবে আমারই কণ্ঠ, আমারই স্বর, আমারই ধ্বনি-মাধুরী উপাসনা পরিচালকের কণ্ঠে, স্বরে, ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমাকে যারা ভালবাস, আমি পার্থিব শরীর ও পার্থিব কণ্ঠ নিয়ে থাকি আর না থাকি, তারা আমাকে সমবেত উপাসনায় তোমাদের মধ্যে পাবে। লক্ষ যোজন দূরে থেকেও আমি উপাসনার কালে তোমাদের মাঝখানে এসে বসব, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, তোমাদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, তোমাদের মনে মন ঢেলে, তোমাদের গায়ে গা লাগিয়ে ঠিক্ তোমাদের মাঝে থাকব। যে বিশ্বাসী, সে আমার এই প্রতিশ্রুতি মনে রে'খ। জগতে আমি তোমাদের কণ্ঠের সমবেত উপাসনার স্বরলহরী শোনবারই জন্য কাঙ্গাল। এ কথাটী তোমরা ভুলো না। যারা বিশ্বাসী, ক্রমশঃ তারা উপলব্ধি কত্তে সমর্থ হবে যে, তোমাদের উপাসনার কালে উপাসনার মাঝে তোমাদেরই পাশখানটায় ব'সে প্রাণ-ভরা আনন্দ পাবার লোভে আমি সুনিশ্চিতই আসি।

উপাসনার সুর জানেন, এমন লোক এখানে অত্যন্ত কম ছিলেন কিন্তু উপাসনা বেশ জমিল।

সাধনে একনিষ্ঠার আবশ্যকতা

উপাসনান্তে বহুজনের দীক্ষা হইল। কেহ কেহ একবার কুলগুরুর কাছ হইতে দীক্ষা নিয়া পুনরায় শ্রীশ্রীবাবার কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন,—দুই নৌকায় পা দেওয়া ভাল নয় বাবা। একটী জিনিষ নিয়েই থাক। বারংবার মন্ত্র নেওয়া আর দশ গণ্ডা মন্ত্র জপ করা বড় ঝক্‌মারি। মনকে

একনিষ্ঠ কর, একটা নিয়ে লেগে থাকার ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ় মনোবৃত্তি অর্জ্জন কর। ডুব্‌বে ত' একজনকে নিয়েই ডোব, ভাস্‌বে ত' একজনকে নিয়েই ভাস, মর্‌বে ত' একজনকে নিয়েই মর, বাঁচবে ত' একজনকে নিয়েই বাঁচ। বিবাহে যেমন চাখাচাখি চলে না, দীক্ষায়ও তেমনই জান্‌বে। এক ভৃত্যের যেমন বহু প্রভু থাক্‌লে চলে না, মন্ত্রেও জান্‌বে তেমন। একটা মাত্র মন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে সঙ্কল্প কর্‌বে,—"মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্—হয় এই মন্ত্রে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জ্জন কর্ব্ব, নয় শরীর পাত কর্ব্ব,—এর মাঝে আর মধ্য-পথ নেই, আপোষ নেই।" একটি মন্ত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে ঐ একই মন্ত্রের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল মন্ত্র তোমার সাধন করা হ'য়ে যাবে। "একজনারে জান্‌লে আপন বিশ্বভুবন আপন তোর।"

ভগবানের নিকট প্রার্থনা

দূরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে কয়েকটী ছোট ছোট ছেলে দীক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে করণীয় সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়া শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে আপাততঃ দীক্ষা গ্রহণে বিরত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ঘুম থেকে উঠেই প্রত্যহ পিতামাতার চরণে প্রণাম কর্‌বে। হাত-পা-মুখ-চোখ ধু'য়ে কাপড় ছেড়ে মেরুদণ্ড সরল ক'রে আসনে বস্‌বে এবং ভগবান্‌কে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বল্‌বে,— হে ভগবান্, হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি আমাকে সৎ কর, মহৎ কর, চরিত্রবান্ কর, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর। হে বিশ্বস্রষ্টা পরম-প্রভু, তুমি আমাকে স্বাস্থ্য দাও, বীর্য্য দাও, সততা দাও, সৎ-সাহস দাও, তুমি আমাকে জগৎ-মাঝে নির্ভীক ভাবে চল্‌বার শৌর্য্য দাও, তোমার প্রিয়কার্য্য

সাধনে আত্মদান করবার শক্তি দাও।" প্রত্যহ এইরূপ প্রার্থনার অভ্যাস ক'রে ক'রে চিত্ত নির্ম্মল হবে, মন সরস হবে, আধ্যাত্মিক পিপাসা ক্রমবর্দ্ধমান হবে। দীক্ষা তোমাদের তখন দিব।

পুত্রকন্যার প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য

দীক্ষাপ্রার্থী বালকদের মধ্যে একজনের অভিভাবক সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—নিজ নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষা গ্রহণ করাবার জন্য যে পিতামাতার আগ্রহ দেখা যায়, স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে, সেই পিতামাতা সত্যই সন্তানের প্রকৃত কুশলপ্রার্থী। কিন্তু পুত্র-কন্যাকে শুধু দীক্ষা নেওয়ালেই চল্‌বে না, এরা যাতে নিয়মিত সাধন-ভজনে নিষ্ঠাযুক্ত হ'য়ে চলে, তার জন্য হাতে ধ'রে তাদের টেনে টেনে নিতে হয়। আর, সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের চখের সাম্‌নে নিয়মিত সাধনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য নিজেরাও সত্য সত্য সাধন-ভজনে মন দেওয়া। পুত্রকন্যা ঈশ্বরানুরাগ-সম্পন্ন হোক্‌, শুধু এইটুকু আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লেই যথেষ্ট হবে না, নিজেদেরও ঈশ্বরানুরাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে দেখাতে হবে।

রুগ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দীক্ষা

অন্য একটী মহিলা দীক্ষা নিলেন, যাহার স্বামী অনেক পূর্ব্বেই দীক্ষা নিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে দীক্ষা পান নাই। অথচ শ্রীশ্রীবাবা এই মহিলাটীকে সর্ব্বদাই এমন ভাবে পত্রাদি লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যেন মহিলাটী শ্রীশ্রীবাবার নিকটে পূর্ব্ব হইতেই দীক্ষিতা। এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া মহিলাটীর স্বামী শ্রীশ্রীবাবাকে বলিলেন,—আপনি হয়ত খেয়াল করেন নাই যে আমি যখন দীক্ষা নেই, তখন আমার স্ত্রী দীক্ষা নিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—দীক্ষা ত' বাবা অনেক রকমে হ'তে পারে। তোমার স্ত্রী যখন রোগশয্যায় প'ড়ে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে' আর আমি তোমার শ্বশুর-বাড়ীর গ্রামে ব'সে আমার এক সাময়িক আশ্রমের পুকুরের মাটী কাট্‌ছি, তখন কি কোনও অদৃশ্য শক্তি এসে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত্র রুগ্নের শিয়রে ব'সে অবিরাম অবিশ্রাম তাকে ইষ্টনামের মধুর ঝঙ্কার শুনিয়ে দীক্ষা দিয়ে আস্‌তে পারে না? আমি সেই দৃষ্টিতেই তোমার স্ত্রীকে দীক্ষিত ব'লে জ্ঞান করে এসেছি এবং তাৎকালিক সুপ্ত স্মৃতিকে পুনর্জ্জাগরিত করার উদ্দেশ্যেই মাত্র আজ প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা দিলাম।

মানুষের কল্পনাতীত পাশবতা

ভিন্ন গ্রাম হইতে আগতা একটী সদ্যঃ দীক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাকে বলিলেন,—এই পৃথিবীতে মানব-মনের দেবত্বের যেমন কোনও সীমা নাই, পশুত্ব, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতারও তেমন সীমা নাই। মা ব'লে তোমাকে ডাক্‌বে, পবিত্রতার ভাণ ক'রে তোমার সঙ্গে গভীর স্নেহভাব জমাবে, তারপরে একদা নিদারুণ পৈশাচিক মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তোমার মর্য্যাদার উপরে সহনাতীত আঘাত হান্‌বে, তোমার নারী-সম্ভ্রমের মহিমাকে ধূলি-লুণ্ঠিত কর্ব্বে, এমন আম-মাংস-ভোজী রাক্ষস এই মনুষ্যজাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু তার জন্য ভয় পেয়ো না মা। এই সকল অসুরকে দলন করার শক্তি তোমার ভিতরে আছে।

মা হওয়া

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সন্তানের মা তুমি স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু নিজ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যা সীমাবদ্ধই ত' থাকবে! শুধু তাদের

দিয়েই তোমার অন্তরের মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটে যাবে না। মা হবে ব'লেই মেয়ে হ'য়ে জন্মেছ। তাই নিজের সন্তান ছাড়াও আরো জননীর সন্তান-দেরও মা তোমাকে হ'তেই হবে। কিন্তু 'মা' তুমি নির্দ্দিষ্ট-ভাবে একজন বা দুই জনের হ'য়ো না, মা হবে নিখিল ভুবনের। নির্দ্দিষ্ট-ভাবে একজন বা দুই জনের মা হ'তে গেলেই ক্রমশঃ সম্পর্কটায় পঙ্কিলতা আসে, দুর্ব্বলতা আসে, মোহ আসে। তার ফল হয় বিষময়। মুখে মা ডাকা খুবই সহজ কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে মা ব'লে ভাব্‌বার মত পবিত্র মন জগতে কয়টা পুরুষের? তাই, মা-হবার কালেও হবে একাধারে পরমস্নেহশীলা ও অনাসক্ত, যুগপৎ মমত্ব-মহিমাময়ী এবং নির্ব্বিকার। মা যে হয়, সে স্নেহ যেমন দেয়, তেমন দোষ, ত্রুটী, অপরাধ, অন্যায় দেখ্‌লে সন্তানের চরিত্র-সংশোধনের কামনায় তাকে কঠোর শাসনও করে। জেনে শুনে যে মা সন্তানকে দুর্ব্বৃত্ত হ'তে দেয়, সে মা 'মা' নয়, সে সাক্ষাৎ ডাইনি।

মায়ের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মা এত মহৎ যে, জগতের কোনো মহৎ বস্তু তার মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন কত্তে পারে না। মা এমন সুন্দর যে, জগতের কোনো সুন্দর বস্তুর সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে না। মা এমন মধুর যে, সহস্র অমৃতসমুদ্রও তাঁর এক কণা স্নেহদৃষ্টির সমকক্ষ হ'তে পারে না। সেই মা ডাককে যে একটা কথার কথায় পরিণত করে, তার মত দুর্ভাগ্য ও দুঃশীল জগতে আর কেউ নেই। এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখো। আর মনে রেখো, জগতের প্রত্যেকটী নরনারীর মা হবার জন্যই তুমি নারী-শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ।

নামই পরম ধন

অপর এক দীক্ষাপ্রাপ্তকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুঃখ, দারিদ্র্য,

অনটন, অন্নকষ্ট প্রভৃতি কোনো কিছুকেই বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য কর্ব্বে না। জান্‌বে, মঙ্গলময় ভগবন্নামই তোমার পরম ধন। এই পরম ধনে তোমার প্রকৃত অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য আজ থেকেই আপ্রাণ প্রয়াসে নামের সাধনে একান্ত ভাবে ব্রতী হও।

ভাণী ও লক্ষ্মীপুর

ঐ দিবসই বেলা চারি ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ভাণী রওনা হইলেন। ভাণী সেবাশ্রমে পৌছিতে একটু রাত্রি হইল। প্রায় দুই মাইল আগাইয়া আসিয়া ভাণীর যুবকবৃন্দ "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পল্লীর মাঠে মাঠে পবিত্র হরিনামধ্বনি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ভাণী সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীবাবা আরও কয়েকবার আসিয়াছেন। আকুমার ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ আদর্শনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার শ্রীশ্রীবাবারই শ্রীচরণে একনিষ্ঠ ভাবে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া এই প্রতিষ্ঠানটী পরিচালন করিতেছেন। এখানে আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবা যেন একটা পরম তৃপ্তি আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

সমবেত উপাসনা ও বিশ্বের ঋণশোধ

পরদিন ৫ই পৌষ শনিবার প্রাতে ভাণী সেবাশ্রমে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল।

উপাসনান্তে একজন উপাসনার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপাসনাকে কেবল নিজের আত্মিক রসাহরণ ব'লেই জ্ঞান ক'রো না। নিখিল জগতের কাছে তোমার ঋণ আছে, দেশ ও সমাজের কাছে তোমার ঋণ আছে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান

কালের কাছে তোমার ঋণ আছে। সেই ঋণ শোধ হবে তোমার সর্ব্বতোভাব আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। একাকী তোমারই আত্ম-সমর্পণ নয়, চতুর্দ্দিকে যেখানে যাকে পাও, সবাইকে নিয়ে আত্মসমর্পণ। সমবেত উপাসনা এক মহাযজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞে তুমি নিজেকে দেবে আহুতি, তোমার প্রতিবেশীকে দেবে আহুতি। নিজের সুখের, নিজের তৃপ্তির জন্য নয়, পরন্তু পরমমহেশ্বরের অভিরুচি অনুযায়ী জগতের নিত্যকল্যাণের জন্য।

স্বামীর অমতে দীক্ষা

ইহার পরে বহু দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের ও জমিদার-পরিবারের মহিলারা পাঁচ ছয় মাইল দুর হইতে পদব্রজে হাটিয়া আসিয়াছেন দীক্ষা নিতে। একটী মহিলার স্বামীর অসম্মতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,--হিরণ্যকশিপু চান নি যে কয়াধূ বা প্রহ্লাদ হরিনাম করুন, তবু তাঁরা স্বামীর বা পিতার নিষেধ মান্য করেন নি, নিজ নিজ পরম কর্ত্তব্যে প্রাণ মন সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তার কারণ এই যে, তাঁরা জেনেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুকে কখনো এপথে আনা যাবেনা। কিন্তু এই যুগে হিরণ্যকশিপুর ঠিক অবিকল প্রতিরূপ পাওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার। চেষ্টা করলে এই যুগে সব পিতা বা সব স্বামীকেই একদা ভগবানের পথে টেনে আনা যায়। এই কারণে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অথবা তার প্রসন্ন মনের পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ ক'রে তবে স্ত্রীলোকদের দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। নতুবা স্বামীর উৎপাতে সাধন-ভজনে নিত্যই নানা বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্নের মূল উৎপাটনের উপায় হ'ল স্বামীকে নিয়ে এক সঙ্গে দীক্ষা নেওয়া, নতুবা তাঁর পূর্ণ-সমর্থনের মধ্য দিয়ে দীক্ষিত হওয়া। সাধ্বী স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজের সেবাবুদ্ধি, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দিয়ে স্বামীকে

সৎপথে গমনে বাধ্য কত্তে পারে। সুতরাং উতালা না হ'য়ে তার একাগ্র মনে কাল-প্রতীক্ষা করাই ভাল।

দীক্ষা ও অনন্ত-জীবন

একজন ভদ্রলোক নোয়াখালী জেলার এক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার মাতৃদেবী গুরুতর পীড়িত। তিনি কাহারও নিকটে শুনিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবা যোগ-বলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, মৃত্যুন্মুখকে নব-জীবন দিতে পারেন, যার আয়ু নাই, এমন ব্যক্তিকেও নিজ আয়ু দিয়া দীর্ঘায়ু করিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল শক্তির কিছুই তাঁহার নাই বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন।

তখন ভদ্রলোক দীক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন।

এক উদ্দেশ্যে আসিয়া অন্য কাজে আগ্রহী কেন হইতেছ, শ্রীশ্রীবাবা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পরে আগন্তুক বলিলেন,—"মাতৃদেবীর জর-দেহের মৃত্যু নিবারণের লক্ষ্যে এখানে আসিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সেটা যে প্রকৃত প্রস্তাবে উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা আমি বুঝিয়াছি। অমৃতময় সমবেত উপাসনা আমার প্রাণের ভিতরে এক নূতন আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই আমি অনন্ত-জীবন লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ, দীক্ষায় অনন্ত-জীবন লাভ হয়, একথা সত্য কিন্তু বাবা দীক্ষা নিয়ে সাধন কত্তে হয়।

অবগুণ্ঠন তুলিয়া ফেল

শ্রীশ্রীবাবা নবীয়াবাদ থাকিতে কল্যই তাঁহার নিকটে সংবাদ

পৌঁছিয়াছিল যে, পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী * ইলিয়টগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতে মনোরম শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মীপুর গ্রামে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে এবং শোভাযাত্রাকারিণী মহিলাদের সংখ্যাই এক শতের উপরে হইবে। অন্য ভাণীতে সংবাদ পৌঁছিল যে, পূজনীয়া সাধনা দেবী প্রাতঃকালে গ্রামবাসী যুবক ও বালিকাগণ সহ হরি-ওঁ কীর্ত্তন সহকারে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পরিক্রমা করিয়াছেন, তৎপরে গ্রামবাসীদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার খোঁজ লইবার জন্য পুনরায় দশ বারো খানা বাড়ী ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অপরাহ্ণ আড়াইটার সময়ে দেড়ঘণ্টা-ব্যাপী একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় মহিলারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। লক্ষ্মীপুরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—"নারী জাতির কর্ত্তব্য শুধু রন্ধন গৃহের মধ্যেই নয়, তার কর্ত্তব্য বিশাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারিত। আজ একথা হয়ত তোমরা বুঝবে না, কিন্তু এমন দিন অতি সম্মুখেই আসছে, যেদিন নারীকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটী কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে বীরপদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। অবগুণ্ঠনবতী পুরনারী তোমরা ঘোমটাটাকে ঠেলে আজ ছোট কর, সমগ্র জগতের প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাও, কোথায় তোমাদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র, কোথায় তোমাদের সেবার অধিকার, তা আজ নিজের চখে দেখে নাও, নিজের বিচারে বুঝে নাও। চিরকাল ধ'রে যে সব সংস্কারের মোহ-পাশে বদ্ধ হ'য়ে গৃহকোণে আবদ্ধ থেকে থেকে কেবল সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, পরশ্রী-

---

* পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীকে শ্রীশ্রীবাবার অধিকাংশ শিষ্যই দিদি বা দিদিমণি সম্বোধন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের সম্পাদক দিদি সম্বোধন করেন না বলিয়াই গ্রন্থে "দিদি" বা "দিদিমণি" রূপে কথাটি উল্লিখিত হয় নাই।

কাতরতা এবং দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করেছ, মনে কেবল ভীরুতা আর ফুস্‌ফুসে কেবল যক্ষ্মা-বীজাণুর চাষ করেছ, আজ তার বিপরীত পথ আশ্রয় কত্তে হবে। শুধু ঘোম্‌টা দিয়েই তোমাদের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে না, আজ তোমাদের রণরঙ্গিণী বেশ ধারণ ক'রে জগতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন কত্তে হবে। বহিঃপৃথিবীর আজ ডাক এসেছে,—জাতি, ধর্ম্ম, দেশ মুক্তি-কামনায় তোমাদের মুখপানে তাকিয়ে আছে।"

বিদেহী আত্মার বাণী

এই সংবাদ ভাণীতে পৌছিতেই শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার বারংবার দুঃখ করিতে লাগিলেন,—"দিদিমণিকে কেন বাবামণি এখানে নিয়া আসিলেন না।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাবাহে, শুধু বাংলা দেশে আশী হাজার গ্রাম। আমি ত' পঁচিশ বছর ধ'রে পায়ের তলার চামড়া ঘ'ষে শেষ ক'রে দিলাম, কিন্তু কয়টা গ্রামে যাওয়া হ'ল? ইচ্ছা ত আমার ভারতের প্রত্যেকটী গ্রামে সাধনাকে পাঠাই বা নিজে যাই আর সকলের মোহ-ঘুম ভাঙ্গি। কিন্তু একা আমি কত কাজ কর্ব্ব, আর দুজন চারজন সহকর্ম্মী বা সহকর্ম্মিণী দিয়েই বা কত কাজ করাব? আমি চাই, অশরীরী হ'য়ে তোমাদের নাসার বায়ু, বুকের স্পন্দন রূপে ঘরে ঘরে কাজ কত্তে। আমার বা সাধনার পাঞ্চভৌতিক কণ্ঠ কত কাজ কত্তে পারে, কত কর্ণে পৌছুতে পারে? বিদেহী আত্মার বাণী হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কৃত কত্তে চাই, শুনাতে চাই, বাজাতে চাই সে বাণীকে নিজে প্রাণরূপী হ'য়ে।

সভ্যতার মাপকাটি

অপর এক প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পৃথিবীতে কোন্ জাতি না

আজ সভ্যতার গর্ব্ব কর্ব্বে ? সবাই নিজেদিগকে সভ্য জাতি ব'লে প্রচার কত্তে আনন্দ বোধ করে, নিজেদিগকে অসভ্য ভাব্‌তে লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কোন্ জাতি প্রকৃতই সভ্য ? যে জাতি ব্যক্তির সুখের চেয়েও সমাজের সুখকে যোগ্যতর লক্ষ্য ব'লে জানে, ব্যষ্টির কুশলকে প্রাণপণে সমষ্টির কুশলে রূপবন্ত করে, আর তার জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দলননীতির সহায়তা না নিয়ে জ্ঞান-প্রচারের সহজ, সরস, সুবিস্তারিত, ব্যাপক প্রয়াসকে উপায়রূপে গ্রহণ করে। জ্ঞানীর জ্ঞান শুধু তার একার জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। এই জ্ঞানকে যত সহজে, যত নিরুপদ্রবে, যত স্বাভাবিক ভাবে, যত দ্রুত সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে তোমার জাতি প্রচার ক'রে দিতে পার্ব্বে, আমি বল্‌ব, তোমার জাতি তত সভ্য। আমার দৃষ্টিতে এটাই প্রকৃত সভ্যতার নির্ভুল মাপকাঠি।

অভিনয়ের ঝক্‌মারি

গত রাত্রিতে গ্রামের যুবকেরা সুরথ-উদ্ধার নামক যাত্রাগানের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীশ্রীবাবা রাত্রি জাগিয়া তাঁহাদের অভিনয় দেখিবেন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের তারিফ করিবেন, উৎসাহ-বাণী শুনাইবেন। কিন্তু নবীয়াবাদের শ্রমপূর্ণ দিন কাটাইয়া নিশার অন্ধকারে ভাণী পৌছিয়া তাহার পরে আর এইরূপ অনুষ্ঠানে যোগদান করা শারীরিক দিক্ দিয়া সহজ নহে। তাই শ্রীশ্রীবাবা যাত্রাভিনয়ের আসরে শুভাগমন করেন নাই। এই বিষয়ে একজন প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তদুত্তরে বলিলেন,—তবে শুন। রহিমপুর-গ্রামবাসীরা একবার নরকাসুর অভিনয় কর্লে'ন। আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আবাল্য যাত্রা-থিয়েটারে উদাসীন ছিলাম, তাই অত্যন্ত জবর-

দক্ষিতে পড়েই যেতে সম্মত হ'লাম। আমার বসবার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করা হ'ল, গদি এল, বালিশ এল, এলনা কেবল গড়গড়াটা, কেন না ধূমপান আমার অভ্যাস নেই। ধর্ম্মমূলক পালা, শুনতে ভাল লাগ্‌ল। নরকাসুরের অভিনয় যিনি কর্লেন, তাঁর বাড়ী ধামঘর এবং তিনি বয়স্ক লোক। এমন নিখুঁত কলাপূর্ণ অভিনয় গ্রামদেশে প্রত্যাশার অতীত। আমি যাত্রা-থিয়েটার না দেখ্‌লেও 'কলা' জিনিষটা বুঝি। বামুনের ছেলে কিনা, চাল-কলাটা বাল্যকাল থেকেই পরিচিত।

সবাই হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এর চাইতেও একজন বয়ঃ-কনিষ্ঠ অভিনেতাকে আমি শ্রেষ্ঠার্ঘ প্রদান কর্লাম এই ভেবে যে, কলাকার হিসাবে ইনি দ্বিতীয় হ'লেও বয়সের হিসাবে এঁর কৃতিত্ব অধিক এবং এঁর সম্মুখে আত্ম-বিকাশের বিশালতর ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটীতে অনেকের মনে কষ্ট হ'ল যে, প্রকৃত যোগ্যতম ব্যক্তি তার পূজা পেল না। ফলে, আমিও মনে কষ্ট পেলাম। এই জন্যে কাল তোমাদের যাত্রাভিনয় না দেখা ভালই হয়েছে। কি বল? যাত্রা-থিয়েটারে অরসিক ব্যক্তির পক্ষে বিচার-বিভ্রাট ত' হ'তেই পারে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—নবীপুর গ্রামের যুবকেরা, 'মন্ত্রশক্তি'র অভিনয় কর্বে। জোর ক'রেই আমাকে নিয়ে সভাপতি ক'রে বসান হ'ল। বক্তৃতায় আমি বেশ ভাল ভাল কথা বল্লাম। কিন্তু অভিনয় হ'তে হ'তে দেখি কি, যেই ছেলেটা আমার সাম্‌নে চল্‌তে গিয়ে সাতবার হাত, পা, গা, কাপড় সাম্‌লায়, মঞ্চে গিয়ে সে চমৎকার চুরুট টান্‌তে সুরু কর্ল্লে! যেন বেঅকুফ বনে গেলাম। বাপ, ঠাকুরদা, গুরুদেব প্রভৃতির

সাম্‌নে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভদ্র, বিনীত, শান্ত ছেলেটী সিগারেট ফুঁক্‌বে,—কেমন, এই দৃশ্য কি খুবই রমণীয়? সেদিনও মনটা বড়ই দমে গিয়েছিল।

শ্রীশ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—পুপুন্‌কী আশ্রমে বার্ষিক উৎসব, গ্রামের ছেলেরা একটা ধর্ম্মমূলক যাত্রা-গান কর্ব্বে। ছেলেদের আনন্দ ছেলেরাই করুক, এই ভেবে আমি আর ওদিক্-পানে যাইনি। কিন্তু লোক অনেক জমেছে দেখে মাঝখানটায় একবার উঁকি মেরে দেখ্‌তে গেলাম। দূর থেকেই দেখি, শ্রীমান্ পঞ্চানন হালদার আর শ্রীমান্ যতীন হালদার নারীবেশ ধারণ ক'রে হাত পা ছুঁড়ে নৃত্য কচ্ছে আর অদ্ভুত সুরে গান গাচ্ছে। হাস্‌তে হাস্‌তে গড়িয়ে মাটিতে প'ড়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে আর থাকা গেল না, ছুটে এলাম খদ্দর-ভাণ্ডারে। উৎসব উপলক্ষে একটী প্রদর্শনী হয়েছিল এবং তাতে পুরুলিয়ার বাবু কিশোরী সিংহ খদ্দরের বিপুল পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। তার ঘরের ভিতরে গিয়ে টাল খেয়ে পড়্‌তেই, তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন। হাসির কারণ জেনে তিনি যখন গেলেন নাচ দেখ্‌তে আর গান শুন্‌তে, তখন তারও ঠিক্ ঐ একই অবস্থা হ'ল। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে যখন খদ্দর-ভাণ্ডারে ফিরে এলেন, তখন তার হাসি দেখে আমার হাসির ফোয়ারা যেন চতুর্গুণ বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। হাসতে হাসতে প্লীহা ফেটে যাবার মত অবস্থা। এমন সময় একজন এসে খবর দিল যে, কল্‌কাতা থেকে যে সি-আই-ডি টা আশ্রমের চালের বস্তার ভিতরে বোমা লুকিয়ে রাখ্‌বার ফিকিরে এসেছে, সেই লোকটাকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ধ'রে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেবার চেষ্টায় রয়েছে। শুনেই মুখের হাসি উবে গেল, প্লীহা-প্রবর আশু বিদারণের হাত থেকে কোনও প্রকারে বেঁচে গেলেন, আমি ছুটলাম সি-আই-ডি'র প্রাণ রক্ষার জন্য

তোমাদের যাত্রাগান শুনেও যদি হঠাৎ সেই রকম হাসি শুরু হয়, তাহ'লে তখন বাঁচবার উপায় কি ? এখানে ত' কোনো সি-আই-ডি তোমাদের আশ্রমের চালের বস্তায় বোমা লুকিয়ে রেখে তোমাদের ধরিয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবার বুদ্ধিতে আসে নি !

সবাই হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—ইংরিজি ১৯২১ সাল। অসহযোগের আন্দোলন। এক খানা নাটক লিখ্‌লাম "প্রেমের জয়"। গ্রীক সম্রাট শেকেন্দার শাহ্‌ ভারত-বিজয়ে এসেছেন। পুরুরাজ বন্দী হয়েছেন। কিন্তু জন-সাধারণ এই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সঙ্গে অসহযোগ কর্‌ল। দলে দলে লোক বন্দী হতে লাগ্‌ল।

স্বেচ্ছাসেবক বীর বালক (সুখময়) গেয়ে যাচ্ছে,—

"আমার মাঠে আমার ঘাটে
গাইব আমি প্রাণের গান,
সাধ্য কে'তায় দেবে বাধা,
আমার মাটি, আমার স্থান"

হুকুম হ'ল,—"প্রহরী, একে বন্দী কর।"

সঙ্গে সঙ্গে অপর বীর বালক (সুকুমার) গান শুরু কর্ল,—

"ভয় দেখিয়ে মা ভুলাবে
আমরা কি ভাই তেম্‌নি লোক ?
দেশের সেবায় জীবন দিতে
নাই আমাদের বিন্দু শোক।"

হুকুম হ'ল,—"প্রহরী, একেও বন্দী কর।"

সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বীর বালক (গঙ্গাধর) গান শুরু কর্‌ল,—

"মার্‌বে যত, বাড়্‌বে তত
প্রাণের মাঝে শক্তি মোর,
ব্যথায় ব্যথায় যাবে কেটে
লক্ষ যুগের আঁখির ঘোর।"

স্বেচ্ছাচারী শক্তি যেন উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। হুকুম হ'ল,—"প্রহরী, একেও বন্দী কর।"

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ বীর বালক (তারাচরণ) যেন গর্জ্জন ক'রে উঠে গাইতে লাগ্‌ল,—

"মার্‌তে পার, কাট্‌তে পার,
আজকে তুমি শক্তিমান্‌,
মাথার উপর আছেন জেনো,
দর্পহারী ভগবান্‌।"

ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য স্বেচ্ছাচারী শক্তির হুকুম হ'ল,—"প্রহরী, সবগুলিকে বন্দী কর।"

কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী এতক্ষণে ভুলে গেছেন যে, তাঁরা অভিনয় দেখ্‌ছেন। আত্মহারা শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত চীৎকার উঠ্‌ল,—"তবে আমাদেরও বন্দী কর, আমাদেরও বন্দী কর।"

অভিনয় দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য হ'তে লাগ্‌ল। যার লেখা "কর্ম্মের পথে" রাজনৈতিক গুপ্ত-সমিতির যুবকেরা ছাড়া আর কেউ পড়্‌ত না, তারই লেখা "প্রেমের জয়ের" অভিনয় দেখে, একদিনে হাজার হাজার লোক তাকে চিনে ফেল্ল। সুকুমার, গঙ্গাধর সুখময়,

তারাচরণ এরা যখন এই গান গুলি ষ্টেজে দাঁড়িয়ে কত্ত, তখন শ্রোতাদের শিরায় শিরায় যেন তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হ'ত।

কিন্তু একদিন জানা গেল, অভিনয়কারী অন্যান্য যুবকদের মধ্যে ঘোরতর দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ দিলাম,—সুকুমার, সুখময়, গঙ্গাধর আর তারাচরণ এসব দুর্নীতি-পরায়ণ ছেলেদের সঙ্গে যাবে না। অভিনয় বন্ধ হ'য়ে গেল, লোকে আমাকে গাল দিতে লাগ্‌ল যে, পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছে। বুঝেছ, অভিনয়ের কত ঝক্‌মারি!

ভাণী সেবাশ্রমের কার্য্য-বিবরণী

অপরাহ্ন চারি ঘটিকায় ভাণী সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইল। শ্রীশ্রীবাবা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার তাঁহার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। সমগ্র বৎসরে তিন হাজার রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে এমন একটী সম্প্রদায়ের রুগ্ন লোকের সংখ্যাই শত করা আশি জন, যাঁহারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহযোগ অল্পই করিয়াছেন, কিন্তু বিরুদ্ধ ভাবই পোষণ করিতেছেন। স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-দেরও প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি কোনও দরদ নাই। মুষ্টিমেয় দুই চারিজন লোকের ব্যক্তিগত ত্যাগ এবং শ্রমের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠানটী চলিতেছে। বিদ্যা-দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-নিয়োগ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর বিশেষত্ব

ইহার পরে ভক্ত দাদা একটী চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। এবারকার ভ্রমণে ভক্তদাদার এইটীই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। তিনি বলিলেন,— বাঙ্গালী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব কি। ভারতের

সকল প্রদেশের লোককেই সমদৃষ্টিতে দেখা বাঙ্গালীত্বের সাধনা। এজন্যই বাঙ্গালীর বৃত্তি সেবা-বৃত্তি, নরনারায়ণের পূজার বৃত্তি। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে একই প্রেমময় ভগবানকে দর্শনের চেষ্টাই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। বাঙ্গালী যেন কখনো তার এই বিশেষত্ব ত্যাগ না করে। ভারতের সর্ব্বপ্রথম শ্রমিক সমাবেশের উদ্যোক্তা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার বরাহনগরে এই শ্রমিক সমাবেশ উপলক্ষ্যে বলেছিলেন,—এই সব উড়িয়া, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, তৈলিঙ্গী কুলীদের ভিতরে আমার পূজার দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁকে জাগাতে হবে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—মানুষ শুধু নরই নয়, সে নারায়ণও, তার সেবাই আমার জীবনের ব্রত।

সেবকের কর্ত্তব্য

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার সর্ব্বজনমনোহারী ভাষণ প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সেবকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেবাকে যারা ব্রত রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মনে এই দৃঢ়তা থাকা উচিত যে, যার সেবার জন্য প্রাণকে পণ রেখেছি, সে যদি আমার এই সেবার মর্ম্ম নাও বুঝে, সে যদি আমার এই সেবার কোনো মর্য্যাদা নাও দেয়, তবু আমার ব্রত আমি ত্যাগ কর্‌ব না। গঙ্গা যখন সমুদ্রের দিকে যায়, তখন সে দুই তীরের আর কারো পানে তাকায় না। কিন্তু কোনো কোনো ভাগ্যবান্ গঙ্গা থেকেই এক গণ্ডুষ জল তুলে নিয়ে গঙ্গাতে উৎসর্গ ক'রে বলে থাকে,—"হে গঙ্গে, তুমি যাচ্ছ তোমার প্রাণের দয়িতকে লাভ ক'রে তার পায়ে নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ কর্ব্বার প্রাণের গভীর ব্যাকুলতায়। আমার সাধ্য নেই যে তোমার মত সকল অতীতকে ভুলে, সকল মায়ামোহের বন্ধন ছেদন ক'রে নিজ দয়িতের

পানে ছুটে যাই। কিন্তু এই এক অঞ্জলি জল দিয়ে আমি তোমার সাথে সহযোগ রক্ষা কচ্ছি, তোমার আবেগ-বিহ্বল গমন-পথে আমার একটী অঞ্জলি জল-তর্পণকে তুমি তোমার বুকে ধ'রে নিয়ে পরম দয়িতের পায়ে উৎসর্গ দিও।" এভাবে জগতে অনেক ব্যক্তি সেবাকে ব্রতরূপে গ্রহণ কত্তে না পার্লেও অন্য সেবাব্রতী ত্যাগীর কাজের সাথে সহযোগ রক্ষা করেন। তুমি যদি দেখ, তোমার দেশবাসী তোমার সেবা-যজ্ঞের সমিধ্ আহরণে সহায়ক হ'তে অসম্মত, ক্ষুব্ধ হ'য়ো না, হতাশ হ'য়ো না; যাকে সেবা দিয়েছ, সে যদি হয় তোমার বিরুদ্ধে উদ্যতায়ুধ, তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। সেবা যার ধর্ম্ম, তার সেবা শত্রুরও জন্য, মিত্রেরও জন্য। অথবা যথার্থ ক'রে বল্‌তে গেলে সেবকের দৃষ্টিতে জগতে কেউ শত্রু নেই। যারা তোমাকে বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা তোমাকে বিপন্ন ও বিপর্য্যয়গ্রস্ত করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা তোমার সেবা-প্রবৃত্তির ঐকান্তিকতাকে, দৃঢ়তাকে, নিষ্ঠাকেই পরীক্ষা কচ্ছে। তারা তোমার প্রকৃত প্রস্তাবে শত্রু নয়, তারা তোমার পরোক্ষ মিত্র। প্রসন্ন অন্তরে তাদের সকলের সেবাই হচ্ছে তোমার জীবনের পরম সাধনা।

অনির্ব্বাণ সেবাবুদ্ধি সংরক্ষণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— কিন্তু সেবক এমন উচ্চ মনোভাব শুধু যুক্তির জোরে বা জেদের বলে রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে না। হয়ত কখনো তার মনের বল কমে যায়, হয়ত কখনো তার অন্তরের উদ্দীপনা হ্রাস পায়, হয়ত কখনো জীবসেবার পরিবর্ত্তে আত্মসেবার প্ররোচনা তাকে বশীভূত করে,—সেই সময়ে শুধু যুক্তিতে আর জেদে কোনো কাজ সম্ভব হয় না। তার জন্য পন্থা কি? পন্থা হচ্ছে, বিশ্ববাসীর সর্ব্বজনীন পিতা পরমেশ্বরে অন্তরের অবিমিশ্র প্রেম ও অনুরাগ অর্পণ করা এবং তাঁরই রুগ্ন, দুর্গত,

দুর্ভাগ্যগ্রস্ত পুত্র-কন্যাদের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেবাসিদ্ধ করযুগ প্রসারণের উপযুক্ত শক্তি ও প্রেরণা তাঁরই শ্রীচরণে অনুক্ষণ প্রার্থনা করা। এর ফলে অন্তরে এমন প্রেম-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে, যা তিমিরহারী কিন্তু পরমস্নিগ্ধ, যা লেলিহান-রসনা-সুন্দর কিন্তু সুনিশ্চিত অনির্ব্বাণ, যা নীচ স্বার্থপরতার দহনকারী, সর্ব্ববিধ মনোবিকার বিনাশকারী কিন্তু নিত্যনব জীবহিতকুশলতার জননকারী।

লক্ষ্মীপুর

পরদিন (৬ই পৌষ, রবিবার) প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা স্বগণ-সমভিব্যাহারে ভাণী হইতে রওনা হইলেন। লক্ষ্মীপুর শ্রীযুক্ত রামকুমার সাহার গৃহে শুভাগমন হইল। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর আগমনে গ্রামমধ্যে যে একটা নব উদ্দীপনা সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই গ্রামে পদার্পণ মাত্রই তাহা উপলব্ধ হইল। ভ্রাতা যতীন্দ্র মোহন সাহা যে যথেষ্ট শ্রম-স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল।

শ্রীশ্রীবাবা লক্ষ্মীপুর আসিয়া পৌছিবার পরে গ্রামের যুবকেরা "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন করিয়া সমগ্র গ্রাম ভ্রমণ করিলেন। বেলা এগারটায় একটী কুমারী এবং বহু যুবকের দীক্ষা হইল।

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

দীক্ষাদান-কালে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার জীবনের উপরে শুধু একাকী তোমারই দাবী নয়, এ দাবী নিখিল জগতের। পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, জগৎ সকলে তোমার জীবনের কাছ থেকে সেবা চায়, শান্তি চায়, সৌন্দর্য্য চায়, তৃপ্তি চায়, সুখ চায়, সমৃদ্ধি চায়। তোমার একক শান্তি, একক তৃপ্তি, একক সুখ, একক সমৃদ্ধিই তোমার লক্ষ্য

হবে না, সমগ্র জগতের প্রত্যেকটী জীবকে, প্রত্যেকটী অণুপরমাণুকে তোমার ত্যাগে, তোমার তপস্তায়, তোমার সাধনায়, তোমার আত্মোপলব্ধিতে লাভবন্ত কত্তে হবে। মনে রাখবে, এই চিন্তাটাই তোমার দীক্ষালাভের ভূমিকা। এই তত্ত্বটাই তোমার জীবন-ব্যাপী সাধনার পরিপ্রেক্ষিকা। নিজেকে, নিজের জীবনকে, নিজের সত্তাকে এই আলোকে দর্শন কর, নিজেকে জগন্মঙ্গল-সাধনার সঙ্কল্পে পূর্ণ কর, পরিপুষ্ট কর। তবে তোমার অখণ্ড-মন্ত্র-সাধন সত্য হবে, সার্থক হবে, ষোলকলায় পূর্ণ হবে।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইল। প্রথমে আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা এবং তৎপরে ভক্তদাদা বক্তৃতা দিলেন। সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী গতকল্যই তাঁহার বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া অদ্য আর কিছু বলিলেন না।

দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীবাবার অদ্যকার বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। ইলিয়টগঞ্জ হাইস্কুলের বঙ্গভাষার অধ্যাপক শ্রীশ্রীবাবার এই বক্তৃতা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—এ বক্তৃতার কোনও তুলনা হইতে পারে না, সমগ্র বঙ্গদেশে বোধ হয় এমন ভাষণ প্রদান করিবার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

ইহকাল ও পরকালের নিকট-সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার দুইঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় বলিলেন,—ইহকালের মঙ্গল আর পরকালের মঙ্গল, এই দুটো জিনিষের একটা থেকে আর একটাকে বিযুক্ত ক'রে দেখার দৃষ্টি-ভঙ্গী কোনো কাজের কথা নয়। তোমার ইহকালের কল্যাণের ভিতর দিয়ে পরকালের কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা

কর, পরকালের কল্যাণের ভিতর দিয়ে ইহকালের কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা কর। পরকালের জন্য ইহকালকে, ইহকালের জন্য পরকালকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে জীবন-সাধনা, সেই সাধনা এই যুগের জন্য নয়। নবযুগের নবারুণ-কিরণে ত্রিলোক পরিস্নাত হচ্ছে,—সকল ভয়, সকল কুণ্ঠা, সকল জড়তা, সকল অবসাদ, সকল দুর্ব্বলতা ও সকল শৈথিল্য পরিহার ক'রে প্রাণপণ যত্নে ইহলোকের সাথে পরলোককে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়ে নাও। ঐহিককে পারত্রিকের সাথে দৃঢ়-সংবদ্ধ কর।

ত্যাগের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিরকাল ভারতের আত্মনিষ্ঠ ব্রহ্মদর্শী ঋষিরা তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন,—"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বম্ আনশুঃ"। এখনো আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তোমাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুম-ভাঙ্গানি গান গেয়ে যাচ্ছি,—"শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র, ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ।" কিন্তু এই ত্যাগের মানে কি হবে, গৃহত্যাগ ক'রে দলে দলে অরণ্যে আশ্রয় লওয়া? এই ত্যাগের মানে কি হবে, বহির্জ্জগতের সকল কর্ত্তব্যে উপেক্ষা ক'রে কেবল অন্তর্জ্জগতের তপঃসাধনায় মগ্ন হওয়া? এই ত্যাগের মানে কি হবে, দেশ জাতি ও জগতের গুরুতর প্রতিকার-সাধ্য বিভ্রাট সমূহের সমক্ষে নীরব নিশ্চেষ্ট হ'য়ে অন্ধগৃহকোণে ব'সে থাকা আর নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলদের অসহায় অবস্থায় নিদারুণ বিপত্তির মধ্যে নিষ্পেষিত হ'তে দিয়ে নিজেরা কেবল প্রাণ-পণ শক্তিতে তুলসীর মালা জপ করা, নাক-টিপে প্রাণায়াম করা? নিশ্চয়ই ত্যাগের মানে তা নয়। ত্যাগের মানে বাসনা ত্যাগ, লালসা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-লৌল্য ত্যাগ, আত্মসুখের অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ,—ভোগবুদ্ধি, বিলাস-বিভ্রম, আসক্তি ও লোলুপতা ত্যাগ।

মুক্তিপূত সামঞ্জস্যের পথ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দিকে দিকে কত প্রকারের প্রচারক তোমাদের কত কথা শুনাচ্ছেন। এরা সকলেই প্রতারক নন্। অনেকে মনের অকৃত্রিম আবেগে সরল সৌহৃদ্যবুদ্ধিতে তোমাদের কাছে নিজ নিজ কথা পরিবেশন কচ্ছেন। কিন্তু যিনিই যাই বলুন, তুমি তা বিচার ক'রে গ্রহণ কর। যিনি বল্‌ছেন, সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এস, দেশ, সমাজ, জাতির প্রতি কর্ত্তব্যের দায় তোমার নয়, তোমার দায় আত্মোপলব্ধি, একমাত্র আত্মদর্শন,—বিচার কর, তাঁর কথা কতখানি যুক্তি-শুদ্ধ। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েও কি, ছোট হোক্, বড় হোক্, আর একটা সংসারেরই মধ্যে গিয়ে পড়্‌তে হয় না? কেননা, যেখানে উদর, সেখানেই সংসার। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত' তোমার সঙ্গেই যায়। তৃপ্তি, সুখ ও সুস্বাদ প্রভৃতির প্রয়োজন-বোধ ত' তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও! শ্রমের পর বিশ্রাম, জাগরণের পর নিদ্রা, অনশনের পর আহার, প্রতীক্ষার পর প্রাপ্তি, এসকল ত' তখনো সঙ্গে থাকে! যে দেশে, যে সমাজে, যে জাতির মধ্যে দুর্ব্বৃত্তের উৎপীড়ন চলেছে, সংসার ছেড়ে এসেও সেই দেশ, সেই সমাজ, সেই জাতির দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ থেকে ত' নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে চল্‌তে পার না! সংসারী লোকের গৃহে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন ত্যাগী পুরুষেরও ত' ভিক্ষান্নের অভাব ঘটে! সংসারী মানুষ যখন চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা হারায়, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও ত' সেই অপপ্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কত্তে পারে না! সংসারের পাপ তার উপরেও ছাপ ফেলে, সংসারের তাপ তার উপরেও দাহন-ক্রিয়া সুরু করে। সুতরাং আত্মোপলব্ধি বা আত্মদর্শনই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবু তুমি গৌণ ভাবে হলেও দেশ, জাতি ও

সমাজের প্রতি তোমার কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা কত্তে পার না। আবার, যিনি বল্‌ছেন,—ত্যাগের আদর্শ একটা ভ্রান্ত আদর্শ, ভোগবুদ্ধিই জীবের চিরন্তনী কর্ম্মপ্রেরিকা, ত্যাগবাদ মানুষকে অক্ষম এবং নিষ্কিঞ্চন করেছে, জগজ্জয়ের পরাক্রম থেকে বঞ্চিত করেছে, ত্যাগ কখনো একটা জাতির আদর্শ হ'তে পারে না, ধর্ম্মকে জানতে হবে জাতীয় অভ্যুদয়ের পথ-কণ্টক,—বিচার কর, তাঁর কথাই বা কতখানি যুক্তিশুদ্ধ। ব্যক্তিগত ভোগবুদ্ধির উৎকট প্ররোচনাই না এক মানুষকে অপর মানুষের বৈধ-স্বার্থে আঘাত প্রয়োগের জন্য মিথ্যা যুক্তি, মিথ্যা ছল, শঠতা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে? ব্যক্তির বা দলের অন্তরের মালিন্যই না নানা শ্রুতিসুন্দর যুক্তির রূপ ধারণ ক'রে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে চিরবৈরের উৎপাদন করে এবং যার সাথে যার জীবনেও কোনও প্রকারের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নেই, দেনা-পাওনা নেই, চেনা-শুনা নেই, তাকে দিয়ে তার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করায়, তাকে দিয়ে তার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করায়, তাকে দিয়ে তার অপূরণীয় সর্ব্বনাশ ঘটায়। তুমি ভোগলুব্ধ ব'লেই না, শত ভোগেও তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তৃপ্তি আসে না, অপরের ভোগ্য-বস্তুর প্রতি তাই না তুমি লোলুপ নয়নে তাকাও এবং তোমার দুর্ব্বৃত্ততাকে সজ্জন-সম্মত রূপ দেবার জন্য নানা সুখশ্রাব্য সংজ্ঞা প্রদান কর, তোমার লাম্পট্যকে নাম দাও আর্ট ব'লে, তোমার বিশ্বাসঘাতকতাকে নাম দাও কর্ম্মকুশলতা ব'লে, তোমার অকৃতজ্ঞতাকে নাম দাও বুদ্ধিচাতুর্য্য ব'লে, তোমার দুর্ব্বলতাকে নাম দাও মহানুভবতা ব'লে। কিন্তু অমেধ্য বিষ্ঠাকে যদি কেউ অমৃত ব'লে নাম দেয়, তা হ'লেই কি তা কখনো সুর-গণ-সেব্য হ'য়ে থাকে? সুতরাং আত্মোপলব্ধি বা আত্মদর্শনের পথে দৃষ্টি সঞ্চালিত

ক'রে তোমাকে নীচ স্বার্থপরতার ক্লেদপঙ্ক থেকে নিজেকে উদ্ধার করার মহনীয় ব্রত অবলম্বন কত্তেই হবে, এছাড়া তোমার উপায় নেই। যিনি যাই বলুন, চিলে কাণ নিয়েছে শুনেই তুমি চিলের পিছনে পিছনে দৌড়াতে পার না, তোমাকে স্বকীয় বিচার-বুদ্ধির নিকষ-পাষাণে ঘষে প্রত্যেক কথার যথার্থ মূল্য নির্ণয় ক'রে নিতে হবে এবং বিরুদ্ধ মতামতের গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সামঞ্জস্য বের ক'রে নিয়ে যুক্তিপূত সত্যের পথে চল্‌তে হবে। তোমার পথ সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে,—বিরোধের ভিতর দিয়ে নয়।

কর্ত্তব্যে অটল হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারত চিরকাল ত্যাগের বাণীই শুনিয়েছে কিন্তু তাই ব'লে শৌর্য্যের পথ, বীর্য্যের পথ, পৌরুষদীপ্ত মনুষ্যত্বের পথও কি সঙ্গে সঙ্গেই দেখায় নাই? মন্দিরে মন্দিরে ভারতে কেবলি কি শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিই উত্থিত হয়েছে, প্রান্তরে প্রান্তরে সৌরকরদীপ্ত অসির ঝঞ্ঝনাও কি ওঠে নাই? কিন্তু এই ধর্ম্ম আর এই কর্ম্ম, এই অধ্যাত্মবাদ আর এই দেশাত্মবোধ, উভয়ের ভিতরে চাই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের স্থাপন। তোমরা ভুলে যেও না যে তোমরা ত্যাগীর সন্তান, ঋষির বংশধর, কিন্তু এ কথাও ভুলে যেও না যে, পৃথিবীর যত দুঃসাধ্য বীরত্ব, যত অকল্পনীয় শূরতা, যত অত্যাশ্চর্য্য মহদ্দৃষ্টান্ত, যত অতুলনীয় আদর্শ-নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উদা-হরণসমূহ তোমাদেরই দেশে ঘটেছে। হীন সুখে, নীচ সুখে, ক্ষণিক সুখে বীতশ্রদ্ধ হও কিন্তু মহৎ ব্রত, মহৎ কর্ত্তব্য, মহৎ প্রয়োজনের মুখে অধ্যাত্মবাদের দোহাই দিয়ে পলায়ন-পর হ'য়ো না। আকাশের বজ্রকে ডেকে বল,—"এস দম্ভোলি, স্পর্দ্ধিত বেগে এস, পার যদি, আমার মস্তক ছিন্ন-ভিন্ন কর, কিন্তু আমি নিজ কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র থেকে কোনো যুক্তিতেই এক

চুল স্থান স'রে দাঁড়াব না।" ভূগর্ভস্থ ভূকম্পনকে ডেকে বল,—"এস হে কম্পন সমগ্র পৃথিবী চুরমার ক'রে, পর্ব্বতকে হ্রদে পরিণত কর, সরোবরকে পর্ব্বতে রূপান্তরিত কর, অভ্রচুম্বী প্রাসাদরাজিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত কর, চূর্ণিত কর, ধূলিমুষ্টিতে পরিণত কর, লক্ষ লক্ষ মৃত-কঙ্কালে ধরিত্রী আবৃত কর, ক্রন্দনের কলরোলে আকাশ মথিত কর, কিন্তু আমি আমার কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র থেকে তিলার্দ্ধমাত্রও ভ্রষ্ট হব না, হব না, হব না।" হাঁক দিয়ে বল,—"এস হে ঝঞ্ঝা করাল-ভয়ঙ্কর, বৃক্ষ-হর্ম্ম্য-পর্ব্বতচূড়া উৎপাটিত ক'রে মহাপ্রলয়ের সূচনা কর, দিকে দিকের অকল্পনীয় বিভীষিকার সৃষ্টি কর, অদমিত আক্রোশে সমুদ্রকে টেনে পর্ব্বতের গায়ে মার আছাড় আর পর্ব্বতকে ঠেলে সমুদ্রের বুকে দাও ডুবিয়ে, আমি কিন্তু লৌকিক ব'লে, পার্থিব ব'লে, কর্ত্তব্যকে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পথ থেকে স'রে দাঁড়াব না, আমি আমার কর্ত্তব্যে থাকব অটল, অচল, সুস্থির। হিমালয় কি কখনো স্থানভ্রষ্ট হয়? হয় কি না জানি না। সে কি কখনো ভয়ে প্রকম্পিত হয়, প্রলোভনে দোদুল্যমান হয়? হয় কি না, জানি না। কিন্তু আমি কখনো হব না স্থানভ্রষ্ট, আমি কখনো আতঙ্কে হব না অধীর, আমি কখনো দ্বিধায় হব না দোদুল্যমান।"

ভুতের ক্যাঁচকেচি

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রামস্থানে আসিয়াছেন, এমন সময়ে বাহিরে সভাস্থলে একটা গোলযোগ শুনা গেল। যেন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তেজিতস্বরে কথা-কাটা-কাটি চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল যে, সভাস্থলে এক পুলিশের দারোগা কনষ্টেবল সহ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত আদর করা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ

হইয়া কি সব মন্তব্য করিয়াছেন, যাহার জন্য একটা গোলযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—এঁরা এসেছিলেন দেখ্‌তে যে আমি ইংরাজ-রাজত্ব উৎখাত ক'রে দেবার জন্য কোনো কথা বলি কি না। কিন্তু দেখা গেল, ইংরেজের সঙ্গে আমার কুটুম্বিতা নেই। কুটুম্বিতা থাক্‌লে এঁদের হাতে কাজ থাকৃত। কাজের অভাবে একটু অস্বস্তি সকলেই বোধ ক'রে থাকে। কিন্তু তোমরা এক কাজ কর। ভদ্র-লোকদের মিষ্টি কথায় শান্ত কর এবং এখানে আদর ক'রে প্রসাদ খাইয়ে দাও। রামায়ণের মধ্যে ভূতের কঁ্যাচকেচি ভাল নয়। এতক্ষণ সবাই শুন্‌লে ধর্ম্মের কথা আর কর্ত্তব্যের কথা, আর তার পরক্ষণেই হবে অতিথির প্রতি রুক্ষ ব্যবহার আর অসৌজন্য? এ ত' ভাল কথা নয়।

সত্য ও সঙ্গতি

রাত্রিতে একটী বর্ষীয়সী মহিলা শ্রীশ্রীবাবার নিকটে তাঁহার প্রাণের বেদনা জানাইতে আসিলেন। তাঁহার পুত্রকে তিনি বিবাহ দিয়াছেন এমন এক গৃহে, যেই গৃহের কন্যার সাথে নিজ পুত্রের বিবাহ-সম্পর্কে তিনি পুত্রের শৈশবেই কথা দিয়াছিলেন। পুত্র বড় হইল, কন্যাও বড় হইল, কিন্তু কন্যার শরীরে ও বুদ্ধিতে নানাবিধ অপূর্ণতার ত্রুটী বয়ো-বিকাশের সঙ্গেও দূর হইল না। কিন্তু সত্যরক্ষাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তিনি ঐ কন্যার সহিতই নিজ পুত্রের বিবাহ দিলেন। এক্ষণে পুত্র ত' আর নিজ পত্নীর সঙ্গে অবস্থান করে না,, সে অবিবাহিত কুমারের ন্যায় সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। ইহাতে সংসারে সকলের মনেই কষ্ট। ইহার প্রতিকার কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মা, পুত্র-কন্যার বিবাহের মত জটিল ব্যাপারে

সত্যরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকালের সঙ্গতি-রক্ষাও প্রয়োজন। সত্য সর্ব্ব অবস্থাতেই পালনীয়, কিন্তু যে সত্য সঙ্গতিকে অতিক্রম করে, সে সত্য প্রকৃতই সত্য কি না, তা বিচার ক'রে দেখ্‌তে হয়। সত্যের স্থান ত মা মুখে নয়, তার স্থান বুকে। সত্যের স্থান কথিত শব্দগুলির মধ্যে নয়, যে অভিপ্রায় থেকে শব্দগুলির উদ্ভব, সত্যের স্থান সেই মূলগত অভিপ্রায়ে। পুত্রকে বিবাহ দেবে কথাটার মানে এই যে, পুত্র পত্নীকে নিয়ে পত্নিজনোচিত সুখ-শান্তি যাতে পায়, তা কর্ব্বে। কিন্তু তাহ'লে তোমার পুত্রবধূর নানাবিধ অপূর্ণতার দরুণ তা ত' তোমার পুত্রের পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে। সুতরাং বলতে হবে, বিয়ে দিয়েও তোমার সত্য-রক্ষা হয় নি। আর যদি মুখচন্দ্রিকা ক'রে মন্ত্র পড়ান, যজ্ঞ করান পর্য্যন্তই তোমার অন্তরের প্রভিপ্রায় ছিল, তবে তা ত' হয়েই গেছে, সুতরাং সত্য তোমার রক্ষিতই হয়েছে। অতএব সত্যরক্ষার ফলে যদি স্বাভাবিক নিয়মে কোনও অসুখ-অশান্তি এসেই থাকে, তবে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, সেই অশান্তিকে ধীর চিত্তে মেনে নাও। এবং সবই ভগবানের ইচ্ছা ব'লে সহ্য কর। বুদ্ধি এবং শরীরের অপূর্ণতার দরুণ নিজ পত্নীকে যদি তোমার পুত্র ভালবাসতে না পারে, তবে জোর ক'রে ত' তাকে দিয়ে ভালবাসান যাবে না! পুত্রের উপরে যতই জোর খাটাতে চাইবে, ততই তার মন আরো বেঁকে যাবে। সুতরাং এই ব্যাপারে, নিজেরা নির্লিপ্ত থেকে সংসারকে অশান্তি থেকে বাঁচাও। বধূকে বুঝাও যে, জগতে বহু বহু নারী চির-কৌমার্য্যের জীবন যাপন করেছেন। সেই জীবন দোষাই নয়, গৌরবের।

বিবাহের জুয়া-খেলা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহের উদ্দেশ্য যদি হয় বলবান্ পূর্ণেন্দ্রিয়

উত্তম সন্তান-সন্ততি লাভ, তাহ'লে পিতামাতার কখনো কর্ত্তব্য নয়, শৈশবেই কারো মেয়ের বা ছেলের সঙ্গে নিজের ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া। যেই পাত্র বা যেই পাত্রীকে বিবাহযোগ্য বয়সে বিচার ক'রে দেখা হয়নি, তার সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে অঙ্গীকার প্রদান করা ত' জুয়াখেলার মত একটা অনিশ্চিত ব্যাপার! লাভ হ'লে আশার অতীতও হতে পারে, ক্ষতি হ'লে সর্ব্বনাশও ঘটতে পারে। বিবাহ নিয়ে জুয়াখেলা ভাল নয়। কিন্তু তোমরা জুয়াই খেলেছ। এমতাবস্থায় হেরে যাওয়ার দুঃখকে সহ্য করার শক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করাই ভাল হবে মা।

মহিলাটী শান্ত হইলেন না। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুত্র তোমার চরিত্রবান্। বিবাহিতা স্ত্রীতে অনুরাগ অর্পণ অসম্ভব হ'লেও সে ত' আজ পর্য্যন্ত বিপথে চলে নি! সে বরং ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাকে জীবনে কাজে লাগাতে চেষ্টা কচ্ছে। এতে যে তোমার মনে বেদনা, সেটা ত একটা কুসংস্কারেরই প্রভাব মাত্র। মনকে সবল কর এবং পুত্রকে সৎপথে চল্‌তে উৎসাহিত কর।

মালাখালা ও দৌলতপুর

পরদিন (৭ই পৌষ, সোমবার) প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা সাচারের নিকটবর্ত্তী মালাখালা গমন করিলেন। একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নাথের গৃহে উঠিলেন। মহেন্দ্র-দা শুধু গুরুনিষ্ঠ-ভক্তই নহেন, একজন শক্তিশালী সাহিত্যিকও বটেন।

দেবীত্বের প্রকাশ কর

এদিকে ঠিক্ সেই সময়েই পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী দৌলতপুর গ্রামে গেলেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর মধুর

ধর্ম্মোপদেশে দৌলতপুর গ্রাম-নিবাসিনী মহিলাদের প্রাণে এক অপূর্ব্ব-সাড়ার সঞ্চার হইয়াছিল। এইখান হইতেই নাকি তাঁহার নূতন নাম-করণ হইয়াছিল,—"নব্যবাংলার সঙ্ঘমিত্রা।"

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী এই দিবস দৌলতপুরে* যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জননীগণ এবং ভগিনীগণ, তোমরা জান তোমরা নারী, তোমরা অবলা, তোমরা পরগলগ্রহস্বরূপা, তোমাদের নিজেদের কোনো শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা আমাকে শিখিয়েছেন যে, নারী শক্তি-স্বরূপিনী। মাতারূপে পুত্রের, পত্নীরূপে স্বামীর, কন্যা-রূপে পিতার, ভগ্নীরূপে ভ্রাতার সে অমিত বল যোগাতে পারে। সে পারে তাদের দেহে দিতে স্বাস্থ্য, মনে দিতে সাহস, হৃদয়ে দিতে প্রেরণা, কল্পনায় দিতে সুদূরপ্রসারিণী দৃষ্টি, চেষ্টায় দিতে একনিষ্ঠা আর উদ্যমে দিতে দৃঢ়তা। নারী এ পারে। তবু সে কেন নিজেকে অবলা ভেবে ম্রিয়মাণা হবে? নারী অবলা নয়। চিরকাল সে অবলা থাক্‌বেও না। প্রকৃতই সে মহাশক্তির প্রতীক, কিন্তু নিজেকে যুগযুগান্তর থেকে কেবলি অবলা ভেবে ভেবে সে এমন দুর্ব্বলতা সঞ্চয় করেছে যে, আজ সেই দুর্ব্বলতা বিদূরণের জন্য তাকে কঠোর সাধনায় অবতীর্ণ হ'তে হবে। সেই সাধনা ধর্ম্মবলের সাধনা, ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধনা, নিজেকে নীচ পরিতৃপ্তির ইন্ধন রূপে পরিণত না ক'রে উচ্চতম অনুভূতির জন্য পবিত্র হোমানলে

---

*এই দৌলতপুর ইলিয়টগঞ্জের সন্নিহিত গ্রাম। এই ভ্রমণেই ইঁহারা আর একটী দৌলতপুরে গিয়াছিলেন, যাহা উজানচর ও রামকৃষ্ণপুরের সন্নিহিত। শেষোক্ত দৌলতপুরের কার্য্য-বিবরণী এই গ্রন্থের মধ্যভাগে দৃষ্ট হইবে।

তিলে তিলে দগ্ধ করার সাধনা। সে সাধনা পরমসুখস্বরূপ ভগবানকে নিজের পরম প্রেয় ব'লে জানার, মানার, অনুভব করার সাধনা। জননী এবং ভগিনীগণ, তোমাদের স্বার্থপরতাই না তোমাদিগকে পুরুষের কাছে ছোট ক'রে রেখেছে? কামের কিঙ্করী সেজে তোমরা দুর্ব্বল পুরুষের শেষ রক্তবিন্দু অকাতরে শোষণ কর ব'লেই না তাদের দৃষ্টিতে তোমরা রাক্ষসী, তোমরা পিশাচী? পুরুষকে বশীভূত করার জন্য তোমাদের হীনতম বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণই না তোমাদিগকে তাদের জঘন্যতর চিন্তাগুলির নিত্যসঙ্গিনী ক'রে রেখেছে? তোমরা যে নরকের দ্বার ব'লে কীর্ত্তিত হ'য়েছ, সে শুধু পুরুষেরই দোষে নয়, কত দেবতুল্য পুরুষকে পর্য্যন্ত তোমরা টেনে এনে নরকের কীটে পরিণত করেছ। তোমরা যে আজ ছোট, তা কেবলি পুরুষের দোষে, পুরুষের অত্যাচারে নয়, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমরা নিজেরাও কম ক'রে রচনা করনি। অথচ, এই পুরুষ-জাতি তোমাদিগকে দেবী ব'লে নাম দিয়েছে, দেবী ব'লে ডেকেছে, দেবী ব'লে পূজা করেছে। সেই পূজায় তাঁদের কৃপণতা ছিল না, কপটতাও ছিল না। আজ তোমরা সেই দেবী হও। আজ তোমরা নিজেদের চরিত্রে, চিন্তায়, বাক্যে, দৃষ্টিতে, ভাবে এবং অনুভূতিতে দেবত্বের পূর্ণ প্রকাশ সাধন কর। তা হ'লেই তোমাদের মানব-জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হবে।

মালাখালার সময়ানুবর্ত্তিতা

পূজনীয়া সাধনা দেবী যেই সময়ে দৌলতপুরে ভাষণ দিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই মালাখালার সভাস্থলেও বিপুল জন-সমাগম হইয়াছিল। আঙ্গিনা কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রায় দুই হাজার লোকের সমাবেশ হইল এবং তন্মধ্যে চতুর্দ্দিকস্থ পল্লীসমূহের সম্ভ্রান্ত ও দরিদ্র সকল

শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন। অখণ্ডভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র ও সুরেন্দ্র চন্দ্র নাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টারই যে ইহা ফল, একথা অবিমিশ্র প্রশংসার সহিত অবশ্য স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কার্য্য-সাফল্যের মূল হচ্ছে শৃঙ্খলা, আর শৃঙ্খলার প্রাণ হচ্ছে সময়ানুবর্ত্তিতা। কঠোর সময়নিষ্ঠা অকাতর কর্ম্মনিষ্ঠার জননী। তোমরা যা করেছ, তা অতীব যোগ্যতার পরিচায়ক। এতগুলি গ্রামের এতগুলি লোককে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যথাস্থানে সমবেত করা একটা আশ্চর্য্য সাফল্য। আজ পর্য্যন্ত সম্ভবত রহিমপুর বাদে আর কোনও পল্লীগ্রামে যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমগ্র জনতার পূর্ণ-সমাবেশ দেখা যায় নি। রহিমপুরের প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য এই বিষয়টার সম্পূর্ণ ভার আমি নিজের উপরে রেখেছি এবং একান্ত নির্ভরযোগ্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের উপরে আংশিক ভারার্পণও করিনি। তোমরা যে দুভাই, অন্যের উপরে ভার না রেখে নিজেরাই দুয়ারে দুয়ারে ছুটেছ, আর প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাস্থলে আস্‌বার জন্য প্রভাবিত কত্তে পেরেছ, এটী বড়ই আনন্দের কথা, বড়ই তৃপ্তি-দায়ক সংবাদ।

ধর্ম্মই ভারতের প্রতিভা

মালাখালার বক্তৃতা বড়ই উচ্চাঙ্গের হইল। চিনামূড়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় সভাভঙ্গে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে গ্রামে বা সহরে এইরূপ বক্তৃতা শুনা যায় নাই। শ্রীশ্রীবাবা ঘড়ি ধরিয়া পূর্ণ দুইঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু হায়, হিমালয়-শৃঙ্গ-বিগলিতা এই শুভ্র-ভাব-নির্ঝরিণীর মেঘমন্দ্রিত উত্থান-পতন কেহ ত' কালীর আঁচড়ে কাগজের বুকে দাগিয়া রাখে নাই। আজ

এই বিবৃতি লিখিতে বসিয়া নোটবুকের অসম্পূর্ণ সংরক্ষণের প্রতি তাকাইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে চোখে জল আসে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। ধর্ম্মই ভারতের মন, ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, ধর্ম্মই ভারতের দেহ, ধর্ম্মই ভারতের আত্মা। ধর্ম্মের মোহন বংশী-নিনাদে এদেশের রাজপুত্র ছেড়ে চলে যায় বিপুল রাজ্যসুখের প্রলোভন, প্রেমমুগ্ধ নবযুবক ছেড়ে চ'লে যায় প্রেমময়ী ভার্য্যার স্নেহকোমল প্রণয়-মেঘ-মেদুর বক্ষের চির-বাঞ্ছিত আলিঙ্গন, দিগ্দেশ-বিজয়ী শৌর্য্যশালী সম্রাট চিরতরে পরিহার করে রক্ত-গঙ্গায় তর্পণ। এদেশের কল্পনা, জল্পনা, ধীষণা, এষণা, বিচারণা, প্রচারণা সব কিছু ধর্ম্মকে নিয়ে। এদেশের বৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ভৈষজ্যবেদ আবিষ্কার ক'রেছেন দেহের সুখের সৌকর্য্য বিধানের জন্য নয়, ক্ষণসুখলোভী দেহকে নিত্যসুখলুব্ধ আত্মার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সাধনের যোগ্যতা দানের জন্য,—এদেশে শরীর-চর্চ্চা ধর্ম্মসাধনেরই অঙ্গ। জগতের নরনারীকে দেহ-সংসর্গ দ্বারা দেহের তৃপ্তি-লাভের পথ প্রদর্শনের জন্যই কামশাস্ত্রবেত্তা এদেশে কামসূত্রের বা যৌনসংস্পর্শযুক্ত তন্ত্রতত্ত্বের অবতারণা করেন না, তাঁর উদ্দেশ্য সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে, ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে ক্ষণাতীতকে, স্বল্পের মধ্য দিয়ে ভূমাকে, নিকৃষ্টের মধ্য দিয়ে পরমোৎকৃষ্টকে কি ক'রে উপলব্ধিতে আনা যায়, তার করিৎকর্ম্ম সহজায়ত্ত সুখসাধ্য সরল উপায় আবিষ্কার করা। এদেশে সন্তান-লাভ পরিজন-সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নয়, যুদ্ধার্থে সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য নয়, পরন্তু স্বকীয় ঈশ্বরোপলব্ধির প্রবল প্রেরণাকে বংশানুক্রমে জগদ্ব্যাপী বিসর্পণ দেবার জন্য, যুগ-যুগ-বিস্তারী ভগবৎ-প্রেম-রস বিস্তারের অভিনব লীলার রসাস্বাদনের জন্য। এদেশে বৃক্ষরোপণ ফলাহরণের জন্য নয়, একমাত্র

ভগবৎ-তৃপ্ত্যর্থে ; শস্যাহরণ গোলাঘর পূর্ণ করার জন্য নয়, একমাত্র ভাগবত কার্য্য সাধনার্থ ; অন্নদান পুণ্যার্থে নয়, প্রসাদের কণায় কণায় ভগবৎ-প্রেমরস বিতরণের জন্য। এদেশের লোক শ্রাদ্ধ করে শুধু নিজের পিতামাতা বা আত্মীয় পরিজনেরই মুক্ত্যর্থে নয়, নিখিল জগতের প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক মানবী, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক প্রাণী,—জীব মানে, যার জীবন আছে এবং জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে অল্প-বিস্তর অনুভূতি আছে, প্রাণী মানে যার প্রাণ আছে এবং প্রাণবত্তার দায়িত্ব সম্পর্কে কোনও অনুভূতি থাকতেও পারে, নাও পারে,—প্রত্যেক পশু, প্রত্যেক পক্ষী, প্রত্যেক কীট, প্রত্যেক পতঙ্গ, প্রত্যেক উরগ, প্রত্যেক কৃমি, এমনকি স্থাণু-সংজ্ঞা প্রাপ্ত স্তম্ভরূপে বিরাজমান অদৃষ্ট-সংজ্ঞ বস্তু পর্য্যন্ত, প্রত্যেকের মুক্ত্যর্থে,—এবং সেই মুক্তির অর্থ প্রত্যেকের পক্ষেই হচ্ছে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবদ্দর্শন, ভগবৎ-প্রেমরসে অভিষিঞ্চন, ভগবদস্তিত্বের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জন।

ভারত-ধর্ম্মের বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই ব'লে কি বলতে হবে যে, পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরা ধার্ম্মিক নন, তাঁদের ভিতরে ধর্ম্মচেতনা জাগে নি, তাঁরা ঈশ্বরপ্রেমিক নন? তা কিন্তু নয়। ধর্ম্মহীন মানব এক অসম্ভব বস্তু। জীব মাত্রেই কোনও না কোনও প্রকারে ধর্ম্মকে আলিঙ্গন কত্তে বাধ্য হয়, —এখন সে তার ধর্ম্মকে যে নামই দিক না কেন। কারো ধর্ম্ম জনহিত, কারো ধর্ম্ম অধিকতম ব্যক্তির অধিকতম সুখ সাধন, কারো ধর্ম্ম স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার, কারো ধর্ম্ম জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা এবং ধর্ম্মের প্রচার, কারো ধর্ম্ম সঙ্গীত, সাহিত্য,, কাব্য বা কলা, কারো ধর্ম্ম মানবকে মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করা, মানবের মানবত্বকে স্বীকার, মানুষকে

পশুর পর্য্যায় থেকে টেনে তুলে এনে মানুষের মর্য্যাদা দান করা, মানুষকে মানুষের প্রাপ্য সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ, উল্লাস, স্বাতন্ত্র্য ও সবলতার অধিকারী করা। মোট কথা, কোনও না কোনও প্রকারের ধর্ম্মানুগত্য প্রত্যেক জাতের ব্যক্তিদেরই আছে, কেননা ধর্ম্মহীন ব্যক্তি আর পত্রহীন বৃক্ষ সমান কথা। কিন্তু ভারত-ধর্ম্মের বিশেষত্ব কোথায়? ধর্ম্মবোধের এই সকল বিকাশকে ভারত অস্বীকার করে না, কিন্তু তার ধর্ম্মবোধের মূলকেন্দ্র হ'ল নিজ জীবনে ভগবৎ-প্রেম-রসের প্রত্যক্ষ আস্বাদন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ, ভগবৎ-পাদপদ্মে নিঃসঙ্কোচে এবং বিনাসর্ত্তে সম্যক আত্মসমর্পণ। তার সহস্র বহির্ম্মুখ ধর্ম্মাচরণের মাঝখানে এইটী হ'ল তার সকল প্রেরণার মধ্যবিন্দু, তার সভ্যতার নানা-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন বৈদূর্য্যমালার এইটী হ'ল মধ্যমণি। "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ-দাস।" তুমি যে তোমার স্বরূপ খুঁজে বেড়াচ্ছ, যেই স্বরূপকে বাহ্য বিকাশ এবং ব্যঞ্জনা দেবার জন্য কত কাব্য, কত সাহিত্য, কত দর্শন রচনা কচ্ছ,—কত আঁকছ ছবি, কত খোদাই কচ্ছ ভাস্কর্য্য-সম্ভার, কত গাইছ গান আর কতই না কচ্ছ রাগ-রাগিণীর আরোহণ, অবরোহণ, আলাপন,—এই সকলের পশ্চাতে একটী মাত্র নিত্য সত্য বিরাজিত যে, তোমার সঙ্গে পরিপূর্ণ সত্য সম্বন্ধ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে, অন্য কারো সঙ্গে নয়। জগতের সকল সম্বন্ধ ঐ একটী মাত্র মহত্তম, বৃহত্তম, প্রেয়স্তম, শ্রেয়স্তম সম্বন্ধের সম্পূর্ণরূপে অধীন। সেই নিত্য সম্বন্ধের সঙ্গে জগতের যেই সম্বন্ধ বিরোধ করে, সেই সম্বন্ধ অস্বীকার্য্য। সেই নিত্য সম্বন্ধের অধীন, অনুগত, অনুচর হ'য়ে সেই নিত্য সম্বন্ধের ছায়ারূপে, প্রতিরূপে, পদানতরূপে যে সম্বন্ধ জগতে যেখানে যখন যার সঙ্গে ছিল, হচ্ছে বা হবে, একমাত্র সেই সম্বন্ধই স্বীকার্য্য। ত্রিজগদ্ব্যাপী ও ত্রিকালব্যাপী নানা সম্বন্ধ-শাখা-সমূহের

মূল কাণ্ড হচ্ছে ভগবৎসম্বন্ধ। নিরুপদ্রবে স্বকীয় ভগবৎ-সম্বন্ধের অনুশীলন কর্ব্বে ব'লেই সাম্রাজ্যের বৈধ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা পাঁচটী ভাই মাত্র পাঁচখানা গ্রাম পেলেই সন্তুষ্ট, এর অধিক কামনা তোমরা কর না, কিন্তু বিনা যুদ্ধে যখন সেই সামান্য ক্ষুদকণার বৈধ অধিকারও তোমাদের প্রদত্ত হবেই না, তখন তোমরা ত্রিলোক-ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে, কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরে সাম্রাজ্যসুখলিপ্সা তোমাদের আর বিষয়-তৃষ্ণায় বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে না, তোমরা তোমাদের নিত্য-সম্বন্ধী শ্রীভগবানের খোঁজে মহাপ্রস্থানের পথে পাদচারণা কর্ব্বে। এই মহাপ্রস্থান নৈরাশ্য-বাদ নয়, প্রাণদয়িতকে ইহজীবনেই এই জড়দেহ নিয়েই দেখ্‌ব ব'লে, পাব ব'লে, প্রেমব্যাকুল-হৃদয়ে আশাক্ষুণ প্রাণে ছুটে চলা। অবশ্য, মহা-ভারতের ঐ লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর চতুর্দ্দিকের নরকঙ্কাল-শ্রেণীর করুণ দৃশ্যাবলির মধ্য দিয়ে করুণায় চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়, বলবিক্রান্ত যদু-বংশের নিঃশেষ-নিধনে, পৌরুষ-প্রখর অশ্বত্থামার নীচতার নিম্নসীমায় অবতরণে, শত শত জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কের অস্তগমনের পরে ঘনায়মান মেঘমণ্ডলের ফাঁক দিয়ে সংসার-বিরাগী ঈশ্বর-প্রেম-ব্যাকুল পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মুখমণ্ডল যেন ঘন বিষাদাচ্ছন্ন ব'লেই মনে হয়। কবি লোক-স্বভাবকে পূর্ণ সম্মান দেবার জন্যই পঞ্চপাণ্ডবের সদাপ্রেমোচ্ছল ঈশ্বরীয়-ভাবকোমল সুন্দর সুকান্ত মুখচ্ছবির উপরে নাট্যশালায় গ্রীণরুম থেকে কতকটা বিষাদের, বিয়োগ-বেদনার, শোক-বিধুরতার ধূম্র-বর্ণ নিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁদের জীবনের বিশেষত্বই যৌবনের বিশেষত্ব, মরণের বিশেষত্ব হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর-সাধন, ঈশ্বর-দর্শন, ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে, নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে, বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে, পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে, উচ্চ-

নীচ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটী মানব জীবনের সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরোদ্দেশে নিজ জীবনকে পরিচালন কর্ব্বে, এই হচ্ছে ভারত-ধর্ম্ম। নিজস্ব এই ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে অ-ভারত।

ধর্ম্মের সরল সত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নিদারুণ এক দুর্ভাগ্যের বশে ভারত তার চিরন্তন আদর্শ থেকে ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্য তার নীচে নেমে গেছে, দৃষ্টি তার কুয়াসাচ্ছন্ন হয়েছে, চরিত্র তার চাপল্যে ভরে গেছে, আদর্শ তার অস্পষ্ট হয়েছে। লক্ষ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য, হনুমানের সেবা-মূর্ত্তি, ভরতের সৌভ্রাত্র্য, একলব্যের গুরুবাক্যনিষ্ঠা, উতঙ্কের উচ্চসংযম, কচের আত্মশাসন, দধীচির আত্মদান, কর্ণের মহাদাতৃত্ব, উশীনরের শরণাগতপালন, এসব আজ কথার কথা, এসব আজ উপন্যাস, এসব আজ গঞ্জিকা-সেবীর প্রলাপ-বচন, মদ্যপায়ীর কল্পনা-বিলাস। কেন? ভারতের সজীব আত্মা মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেদীপ্যমান যে দৃষ্টান্ত সমূহ দেখিয়ে গেল, তা আজ অলসের খেয়াল আর অবিজ্ঞের ভাব-বিলাসের পর্য্যায়ে এসে ঠেক্‌ল কি জন্য? কারণানুসন্ধানের জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না। তোমার জীবনের সমগ্র সাধনার চরম পরিণতি, পরম সার্থকতা, সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ণতা যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে, ঈশ্বরীয় প্রেমে আত্মনিমজ্জনে, এই গভীর সত্যকে তুমি উপেক্ষা করেছ। সংযম বল, সৌভ্রাত্র্য বল, সেবা বল, দাতৃত্ব বল, আত্মশাসন বল আর আত্মদান বল, ব্রহ্মচর্য্য বল, আর শরণাগতপালন বল, এর একটাও নিজের জন্য নিজে নয়, এদের প্রত্যেকের অন্তিম লক্ষ্য, সর্ব্বশেষ উদ্দেশ্য,—নিজেকে ভগবানের করা। ভারতের ধর্ম্মজীবনে এইটা হচ্ছে এক অকপট, অনাড়ম্বর, সরল সত্য। এই সরল সত্যে আজ তোমাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তবে ভারতবর্ষ

প্রকৃত ভারতবর্ষ হবে। ধর্ম্ম কি কতকগুলি দার্শনিক শব্দ-সমষ্টির আলোচনায়? ধর্ম্ম কি কতকগুলি চিত্তমনোহারী আদর্শবাদপূর্ণ বচনের আবৃত্তিতে আর পুনরাবৃত্তিতে? ধর্ম্ম কি শুধু শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক সাহিত্যিকতার আবেশে কতকগুলি মন্ত্রের সৌন্দর্য্যস্বাদ গ্রহণ আর পরি-প্রদর্শন? ধর্ম্ম রয়েছে জীবনের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে, প্রতি চিন্তায়, জীবনের প্রতি ছন্দে, প্রতি তরঙ্গে, প্রতি বিকাশে, জীবনের প্রতি পদ-বিক্ষেপে, প্রতি আত্মবিস্তারে, প্রতি ব্যঞ্জনায়। শুধু এই সহজ, সরল, নিরাভরণ সত্যকে সুপ্রমাণিত করা যে, ভগবানের জন্যই আমার সর্ব্বস্ব, আমার নিজের জন্য আমার কিছুই নয়। অতীতে ভারত যে সভ্যতা গড়েছিল, সে সভ্যতা তুচ্ছ নয়, নিকৃষ্ট নয়, উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তার মেরুদণ্ড ছিল এই ধর্ম্ম, এই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর সত্য।

ভাবী ভারত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সম্মুখে এক ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কচ্ছে। বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল অধোগতির মাঝখান দিয়ে অভ্যুদয়ের এক নবীন প্রেরণা ক্রমশঃ নিজেকে বিকশিত কচ্ছে। ভবিষ্যতের মহান্ দাবী পূরণের জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত হচ্ছে। এই কথা তোমরা বিশ্বাস কর। এই কথা বিশ্বাসের যা স্বাভাবিক ফল, সেই আত্মপ্রত্যয়ে তোমরা ভরপূর হও। আত্মপ্রত্যয়ের যা স্বাভাবিক ফল, সেই দুর্দ্দম্য কর্ম্মস্পৃহা, কর্ম্মোদ্যম, কর্ম্মশক্তির তোমরা বিকাশ কর, প্রয়োগ কর। অতীত ভারত জগৎকে যা দিয়েছে, ভাবী ভারত তার চেয়ে অনেক বেশী দেবে। অতীতের ভারতবর্ষ মানবের যে ভারহরণ করেছিল, ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ তার চেয়ে শতগুণ ভারহরণ কর্ব্বে। ভবিষ্যতের সুবিশাল মহত্বে নিমেষের

জন্যও আস্থা হারিও না। আজ বুক-ভরা সাহস নিয়ে, হৃদয়-ভরা বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হও আর সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে বল,—"অয়মহং ভোঃ—এই আমি আছি।" সমগ্র জগতের নিকটে তোমার মহান্ অস্তিত্ব প্রমাণিত কর এবং নিখিল বিশ্বের দুঃখপুঞ্জের পরিত্রাতা রূপে, বেদনাতুরের ব্যথাহারক পরম বান্ধব রূপে, চিরবঞ্চিতের সর্ব্ব-সম্পদ-ভাণ্ডারের পরি-পূর্ত্তি-দাতা রূপে, আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অহঙ্কারবিমূঢ় অন্ধ চিত্তে ব্রহ্মচেতনার স্ফূর্ত্তিদাতা রূপে তুমি আবির্ভূত হও।

চোরী কিয়া হ্যায় ?

অদ্যও এখানে দাউদকান্দি থানা হইতে একজন দারোগা আসিয়াছেন। কি বক্তৃতা হয়, তাহাই শুনিয়া রিপোর্ট করা তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি যাহা শুনিবেন বলিয়া অনুমান করিয়া আসিয়াছিলেন, কথিত বিষয় সমূহ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইল দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হই-লেন। তদুপরি, বক্তৃতায় তিনি অতিমাত্রায় মুগ্ধও হইলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু এখন তিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বারংবার শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এইরূপ চেহারার একজন স্বামীজীর সম্পর্কে তিনি কোনও দারোগা-বন্ধুর নিকটে কতকগুলি কথা শুনিয়াছেন।

দারোগা-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি কখনো চাঁদপুরে ছিলেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চাঁদপুরে আমি বহুবার গিয়েছি, বাল্যকালের প্রথম তেরো চৌদ্দ বছর সেখানেই কাটাই।

দারোগা-বাবু একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—সেখানে কি আপনি কখনো থানায় গিয়েছিলেন ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—রেলে উঠ্‌তে যাচ্ছি আখাউড়া যাব ব'লে, গাড়ীর গদীর উপরে কম্বল খানা মাত্র বিছিয়েছি, এমন সময়ে একজন দারোগা এসে জান্‌তে চাইলেন আমার পরিচয়। পরিচয় দিতেই বল্লেন যে, আমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে এবং তিনমাস ধ'রেই আমাকে খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বল্লুম, —'বেশ ত! রহিমপুর থেকে গেলাম নোয়াখালী, সেখান থেকে গেলাম দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, পুপুন্‌কী, মেদিনীপুর জেলায়, সেখান থেকে এলাম ঢাকা জেলার গ্রামগুলিতে, তারপরে এই চাঁদপুরে জায়গায় জায়গায় প্রকাশ্য সভায় এত বক্তৃতা দিলুম, তবু আপনারা আমাকে খুঁজে পেলেন না! যাই হোক্, আজ তো পেয়েছেন? এখন যা করার করুন।'

শ্রীশ্রীবাবা একথা বলিতেই দাউদকান্দি থানার দারোগা-বাবু ধূল্য-বলুন্ঠিত শিরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আজ আমার জীবন ধন্য হ'ল। আমি অনুমানই কত্তে পারি নাই যে, সেই মহাপুরুষই আপনি। এক ক্ষুদ্র কাজ কত্তে এসে আজ আমার বৃহৎ কাজ হ'য়ে গেল। রাজদ্রোহ-জনক বক্তৃতা হয় কি না দেখ্‌তে এসে শিবতুল্য মহাপুরুষ দর্শন হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবা কৌতুক সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার এমন সুন্দর বক্তৃতাটা শুনে আপনার ভক্তি হ'ল না, আর চাঁদপুরে যে হাজত-বাস করেছিলাম, সেই কথাটী শুনেই এমন ভক্তি এসে গেল, এর কারণটা কি বলুন ত!

দারোগা-বাবু অতীব নম্রতার সহিত বলিলেন,—ষ্টেশান থেকে আপনাকে এনে থানার হাজতে ভরা হ'ল। গ্রেফ্‌তারকারী দারোগা থানার ভারপ্রাপ্ত বড় দারোগাকে বারবার বল্লেন,—'ইনি একজন মহাপুরুষ, একজন প্রকৃত মহাত্মা, এঁকে হাজতে রাখাও যা খোলা বারান্দায় রাখাও তা,

সুতরাং হাজতবাসের ক্লেশটা এই একটা রাত্রির জন্য এঁকে দেবেন না, আমি গ্যারাণ্টি থাক্‌ছি যে, তিনি পালিয়ে যাবেন না।' কিন্তু বড় দারোগা তা শুন্‌লেন না। ফলে আপনাকে হাজতেই গিয়ে ঢুক্‌তে হ'ল। কিন্তু সবাই দেখে আশ্চর্য্য হ'ল, ঐ যে আপনি হাজতের ভিতরে গিয়ে আসন ক'রে বস্‌লেন, সমগ্র রজনী এক বৈঠায় কেটে গেল, মশা তাড়াবার জন্যও একবার হাত নাড়্‌লেন না। কেমন, আপনিই ত' তিনি?

শ্রীশ্রীবাবা অট্টহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিয়া বলিলেন,—আরো শুনুন। প্রাতঃকালে সিপাহী-বদল হ'ল। নূতন দুজন সিপাহী এসে পাহারার জন্য দাঁড়াল। দুজনেই আমাকে আপাদমস্তক দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কি যে মহৎ কার্য্যটা ক'রে তবে এই পবিত্র অতিথিশালায় এসেছি, তারা যেন আন্দাজ কত্তে পাচ্ছে না। একজন জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—বিনা টিকিটে রেল চড়েছ? আর একজন জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—ক্যা, চোরী কিয়া হায়? আমি দুজনকেই মাথা নেড়ে জবাব দিলাম 'হাঁ'। কেন না, দুটা কথাই আমার পক্ষে সমান সত্য।

সকলে হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ চন্দ্র রায়

পরদিন, ৮ই পৌষ প্রাতে সাতটায় মালাখালাতে নৈয়াইর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র রায় সপরিবারে শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মদর্শনে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র ডাক্তারবাবুর ভিতরে এমন অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবসমূহের সৃষ্টি হইতে লাগিল যে, আমরা এস্থলে তাহা বর্ণনে সমর্থ হইতেছিনা। গত দিবস ডাক্তারবাবু কিছুকাল শ্রীশ্রীবাবার শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার অমোঘ প্রভাব সমগ্র

রজনী জুড়িয়া ডাক্তার বাবুর অন্তরে কাজ করিতেছিল। আজ প্রত্যূষে তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিল। শুদ্ধ আধারে মহাপুরুষদের প্রভাব-শক্তি যে কি ভাবে কাজ করে, তাহা দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। সকলেই বলিলেন,—ডাক্তারবাবু অতীব ধীর স্থির প্রকৃতির লোক। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে। নিত্যধামগত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীআলেখ-বাবার তিনি মন্ত্রশিষ্য।

মহাত্মা আলেখ বাবা

শ্রীশ বাবুর মধ্যে সহসা এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবসমূহের বিকাশের আকস্মিক কারণ কি, এই সম্পর্কে একজনে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহাত্মা আলেখবাবা অতি উচ্চ স্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হরিদ্বারের যূনা আখাড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একেবারে উলঙ্গ থাক্‌তেন। কুমিল্লা টিকার-চর শ্মশান ছিল তাঁর প্রধান প্রিয় বাসস্থান। সহরেও কখনো কখনো আস্‌তেন। শবদাহ কত্তে গিয়ে অনেকেই এই মহাপুরুষের দর্শন পেয়ে নির্ভয় হ'য়ে আস্‌ত। আত্ম-প্রচার নেই, কোনো দম্ভোক্তি নেই, সদাহাস্যময় প্রফুল্ল বদন-মণ্ডল, দেখে অনেকেই আকৃষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমশঃ সহরের দুই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্য হলেন। তখন তাঁর শ্মশানে বাসও শেষ হ'ল। সহরের মধ্যে এসে একটা খালি মাঠের মধ্যে গাছতলায় তিনি তাঁর শিববিগ্রহ নিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। কিন্তু এই মাঠের মধ্যে একটা ছাত্রা-বাস তৈরীর প্রয়োজন পড়্‌ল একজন দানবীর ধনী ব্যক্তির। তিনি শিববিগ্রহ সহ সন্ন্যাসীকে মাঠের সীমানার বাইরে সরিয়ে দিলেন। আলেখ বাবার মনে কষ্ট হ'ল। তিনি কুমিল্লা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন

কাছাড়ের সদর শিলচরে। তিনি চলে যাওয়ার পরে লোকের খেয়াল হ'ল যে, কে এত দিন এখানে ছিলেন, আর কেই বা চ'লে গেলেন। দাঁত থাক্‌তে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা ত' বোঝে না। শিলচরে গিয়েই আলেখ বাবার দৈব মহিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হ'তে লাগ্‌ল। তখন লোকে জান্‌ল যে, ইনি সত্যই এক অতুলন শক্তিশালী মহাপুরুষ।

শিষ্যের মধ্যে গুরু-শক্তির স্থিতি ও প্রকাশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিষ্য করার মানে হচ্ছে, শিষ্যের ভিতরে গুরু-কর্ত্তৃক অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিজেকে স্থাপন করা। সত্যিকারের গুরু এই কার্য্যটী করেন। এমন ভাবে করেন যে, কেউ তা টের পায় না। কিন্তু সত্য সত্যই করেন। আজ আলেখবাবা মর-দেহে নেই, কিন্তু শিষ্য শ্রীশ রায়ের ভিতরে ত' রয়ে গেছেন! শিষ্য তা জানেন না। আমাকে দেখে শিষ্যের ভিতরে কতকগুলি আকস্মিক পরিবর্ত্তন এল, কতকগুলি পূর্ব্ব-সংস্কারের সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়ে গেল, হৃদয়ের কয়েকটা জঠিল গ্রন্থি খুলে গেল, ফলে তাঁর ভিতরের গুরু সিংহ-গর্জ্জনে আত্মপ্রকাশে লেগে গেলেন। এই হ'ল তাঁর এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা সৃষ্টির কারণ। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, কৃতিত্ব তাঁর আত্মপ্রচ্ছন্ন গুরুশক্তির।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার শিষ্যদের মধ্যেও কি আপনি এই ভাবে অবস্থান করেন বাবা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয়!

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনিও কি তাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বেন বাবা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হাঁ। অবশ্য, যদি শিষ্য হয় দ্বিধাহীন আত্ম-সমর্পণকারী, নির্ব্বিচার সেবক, অদোষদর্শী প্রেমিক।

সমবেত উপাসনার বিশ্বজনীনতা

প্রাতে আটটায় মালাখালায় সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। উপাসনাতে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত উপাসনায় বস্‌বার আগে মনে মনে ভাব্‌বে যে, তোমরা কয়েকজন সমসাধকই একাজ কচ্ছ না, ত্রিভুবনের যেখানে যে আছে সাধক বা অসাধক, যেখানে যে আছে বন্ধু বা শত্রু, যেখানে যে আছে পরিচিত বা অপরিচিত, সকলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বসেছ। তোমাদের কণ্ঠে এসে নিখিল বিশ্বের সকল কণ্ঠ সম্মিলিত হ'য়েছে, তোমাদের চিত্তে এসে নিখিল বিশ্বের সকল চিত্ত যুক্ত হ'য়েছে, তোমাদের ভক্তির সাথে নিখিল বিশ্বের সকল ভক্তি সংমিশ্রিত হয়েছে। তোমাদের উপাসনা শুধু এই মালাখালা গ্রামে সমবেত কয়েক-জনের উপাসনা নয়, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মতে ও পথে বিশ্বাসী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের উপাসনা নয়, এই উপাসনা বিশ্বজগতের সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সকল মানবের ভাষাহীন প্রাণীদের, ধ্বনিহীন স্থাণুদের। তোমাদের কণ্ঠ সকলের কণ্ঠের সম্মিলিত রূপ।

দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য

অতঃপর দীক্ষার্থীদের দীক্ষা হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা তোমাদের ব্রাহ্মণ্য দিয়েছে। ভুলে যাও, কে বৈশ্য ছিলে, কে শূদ্র ছিলে। আজ তোমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু নিরন্তর সাধনার দ্বারা এই ব্রাহ্মণ্যকে চির-স্থায়ী রাখ্‌বার দিকে তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সাধনে যেন আলস্য না আসে, অবহেলা না আসে। নিয়ত তত্ত্বাবভাবিত সদ্‌ব্যক্তিদের সঙ্গ ক'রে সাধনের রুচি অটুট অব্যাহত রাখ্‌বে।

প্রসাদ ও ব্রাহ্মণ

বহুলোক প্রসাদ পাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সকলেই আনন্দ সহকারে খেচরান্ন-প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। কেহই জাতিভেদবুদ্ধির পরোয়া করিতেছেন না। শ্রীশ্রীবাবা প্রসাদ-গ্রহণকারীদের মধ্যে এক একবার ঘুরিয়া আসিতেছেন আর বলিতেছেন,—"নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকং, স্বরূপং সর্ব্বভূতানাম্ অখণ্ডং নাদ-রূপকম্।" সবাই জান্‌বে, তোমারা ব্রাহ্মণ, তোমাদের অন্য কোনও জাত নেই।

আমি তোমাদের অন্তরের ভিতরে বাস করি

বেলা দুইটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা মালাখালা ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময়ে বিরহ-ব্যথা-কাতর পুত্রকন্যাদের সেই বিপুল অশ্রু-বিসর্জ্জনের দৃশ্য কে বিস্মৃত হইতে পারিবে? শ্রীশ্রীবাবা সান্ত্বনা-ভাষণে বলিলেন,— আমি কি যাচ্ছি? আমি যে তোদের ভিতরেই বাসা বেঁধে বাস কচ্ছি। আমি দেহ দিয়ে তোদের ভিতরে ঢুকি নাই, ঢুকেছি আত্মা দিয়ে।

চিনামুড়া

মালাখালা হইতে দৌলতপুর ফিরিবার পথে শ্রীশ্রীবাবা মিনিট কুড়ি সময়ের জন্য চিনামুড়া এক ভক্তের গৃহে অপেক্ষা করিলেন। গৃহস্বামীর পত্নী রহিমপুর গ্রামের কন্যা। রহিমপুরে শ্রীশ্রীবাবার একটী আশ্রম আছে। মহিলাটী ফল-মূল-সন্দেশ-নাড়ুর একটী ভোগ সাজাইয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে রাখিলেন। ধূপ দিলেন, প্রদীপ জ্বালাইলেন, প্রণাম করিয়া ভোগ-রাগ গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে একটী সন্দেশ মুখে দিলেন।

রহিমপুরের প্রতি স্নেহ

মহিলাটী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি আর রহিমপুর আশ্রমে থাক্‌বেন না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মাগো, সমগ্র পৃথিবী দড়ি বেঁধে টান্‌ছে। কাকে ছেড়ে কার কাছে যাই বল।

মহিলাটী বলিলেন,—না বাবা, আপনি যদি রহিমপুর আশ্রমে না থাকেন, তা হ'লে রহিমপুরে কখনো গেলে আমাদের মনে হয় যেন সমস্ত গ্রামটাই ফাঁকাফাঁকা, যেন কি একটা বস্তুর অভাব, কে যেন এক প্রিয়জন নেই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পার্থিব শরীর নিয়ে রহিমপুর থাকার কথা বল্‌ছ ত? স্থায়ী ভাবে তা বোধ হয় আর হবে না। এমনকি একদিন হয়ত আশ্রমও না থাক্‌তে পারে। গিরিশ* বড়ই সাত্ত্বিক মনে ভূমিটা আমাকে দিয়েছিল কিন্তু মাগো, আমি ত' আর খাঁচার পাখী নই! উড়াল দেওয়াই আমার স্বভাব, খাঁচায় বসাই বরং কঠিন কথা। অবশ্য রহিমপুরের আশ্রমকে একটা বিরাট, ব্যাপক ও সম্মানজনক রূপ দেবার চূড়ান্ত চেষ্টা আমি করব। আমার সেই চেষ্টার সঙ্গে যদি ভাগ্যবান্ গ্রামবাসীদের সরল স্বচ্ছ প্রাণের ঐকান্তিক যোগ ঘটে, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রামেও একটা বড় জিনিষ অবশ্যই হ'তে পারে। আর যদি তা না হয়, তবে হবে এর বিপরীত। আশ্রম উঠে যাবে, গিরিশের বংশধরেরা কাঁদ্‌বে, আমাকে লোকে গাল দেবে, লজ্জা দেবে, ধিক্কার দেবে। কিন্তু মাগো, কারো একথা মনে থাক্‌বে না যে, এই গ্রামটীতে, এই আশ্রমটীতে প'ড়ে প'ড়ে কত উপবাস-ক্লেশ সহ্য করেছি, আর কত উৎ-পীড়ন আর অপমান হজম করেছি। কিন্তু তবু মা, রহিমপুরকে কত ভাল-

* গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাস। রহিমপুরের ছেলেমেয়েকে দেখ্‌লে ভুলে যাই আমি সন্ন্যাসী, হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে যেন স্নেহের ফোয়ারা ছুট্‌তে থাকে, মনে হয় এরা আমার আত্মজ-পুত্রকন্যা। অপ্রত্যাশিত ভাবে এই চিনামূড়া গ্রামে হঠাৎ যে আজ তোমাকে দেখেছি, কত যে আনন্দ হচ্ছে বল্‌তে পারি না।

দৌলতপুর ও কুতুবপুর

অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা দৌলতপুর পৌছিলেন। গৃহস্বামী মনিবের কাজে বিদেশে গিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হিরণপ্রভা দত্ত অসাধারণ উদ্যম সহকারে সকল সুব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাণে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার অপর সামর্থ্যের প্রয়োজন নিতান্ত গৌণ।

জাগিবার দিন আসিয়াছে

এইখানে আসিয়া জানা গেল যে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী উড়িশ্বর যাইবার পথে কুতুবপুর নামক গ্রামে দেড় ঘণ্টা সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়াছেন এবং একটী জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছেন।

পূজনীয়া সাধনা দেবীর কুতুবপুরের ভাষণের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি বলিয়াছেন,—

"দিল্লীতে গিয়েছিলুম, প্রাচীন কীর্ত্তি দেখ্‌তে। উচ্চতার দিক্ দিয়ে সবার চাইতে যা বিস্ময়কর মনে হ'ল, তা হচ্ছে কুতুব মিনার। একখানা একখানা ক'রে পাথর গেঁথে গেঁথে কত উঁচু এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হ'য়েছে, আকাশের বুক চিড়ে দুই শত আটত্রিশ ফিট উঁচুতে এত সরু একটা স্তম্ভ যে উঠ্‌তে পারে, সেকথা ভাব্‌তে অবাক্ লাগে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি,

মানুষের নিষ্ঠা, মানুষের একাগ্রতা তা সম্ভব করেছে। কুতুবপুর গ্রামে এসে সেই কুতুব মিনারের কথা মনে হ'ল। দিল্লী জয় ক'রে কুতুবুদ্দিন আইবক্ তাঁর দিগ্বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই মিনারটী স্থাপন করেন। আপনাদের এই কুতুবপুর গ্রামে এসে আমার সেই কুতুব-মিনারটীর কথা মনে পড়্‌ল। কিন্তু দিল্লীর কুতুব-মিনারটী একটী নশ্বর গৌরবেরই মাত্র দৃষ্টান্তস্থল। আপনারা কিন্তু তপস্যার বলে সাধনার বলে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন কত্তে পারেন। আমি সেই কথাটিই আপনাদের কাছে ব'লে আজ আপনাদেরও সেবা কত্তে চাই, নিজেকেও উপকৃতা কত্তে চাই। মহৎ হবার যাঁদের আন্তরিক প্রেরণা, তাঁরা তাঁদের দর্শন দিয়ে, স্পর্শন দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে জগতের অগণিত নরনারীর তন্দ্রাচ্ছন্নতা বিদূরিত করেন, দুর্ব্বলতা অপসারিত করেন। আপনারা তাই হোন্। প্রাণপণ যত্নে জীবনের লক্ষ্যকে উর্দ্ধে স্থাপন করুন, আহার, নিদ্রা, আলস্য ও ভয়ে প্রমত্ত, নিমগ্ন, নির্জ্জীব ও ম্রিয়মান মানবসমাজে আপনারা অপ্রমাদ, পূর্ণ জাগরণ, জীবনের উচ্ছ্বসিত স্পন্দন, উৎসাহের বিপুল আলোড়ন আনয়ন করুন। সহস্র বৎসর ঘুমিয়েছেন, আজ জাগ্‌বারই ত' দিন এসেছে! শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র শ্রীমুখে আমরা এই জাগরণের আগমনী-গীতি শুনেছি। নবীন উষার নূতন প্রকাশ হবে, মানব-মানবী দেবতার স্বভাব, দেবতার সাহস, দেবতার শৌর্য্য, দেবতার চরিত্রবল নিয়ে নবীনতর কর্ম্মক্ষেত্রে ভীমবিক্রমে আগুয়ান হবে, মানুষ তার মনুষ্য-জন্ম সার্থক কর্‌বে। নববালক-নববালিকার দল ভক্তিকুসুমের মালা গেঁথে বিশ্বপ্রভুর গলদেশে দেবে পরিয়ে আর নিজেরা তাঁর চরণ-তলে আত্মসমর্পণ ক'রে কৃতকৃতার্থ হবে। নব-যুবক ও নব-যুবতীর দল নূতন পৃথিবী গড়ার আনন্দে অনায়াসে অবহেলে অকুণ্ঠিত চিত্তে হৃদয় চিরে শোণিতের অঞ্জলি

অর্পণ কর্ব্বে আদর্শেরই চরণ-মূলে। প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অতীতের ব্যর্থতার ক্রন্দন ভুলে গিয়ে নূতন ক'রে জীবন-বসন বয়ন সুরু কর্ব্বে। নবজাগরণের দিন আজ এসেছে, ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, আর আপনারা কেউ ঘুমুবেন না।

নারীজাগরণের নবযুগ

দৌলতপুরেও যে পূজনীয়া সাধনা' দেবীর বক্তৃতায় সকলের মনে এক অত্যাশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনা গেল। মহিলা সমাজের ভিতরে নবভাবের উদ্দীপনার জন্য এভাবে পল্লীর পর পল্লী পর্য্যটন এই অঞ্চলে ইতঃপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। তদুপরি পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজীর ভাষণ শুনিবার পূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, গুরুকৃপাতে কতখানি উচ্চাঙ্গের বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই লোকের বিস্ময়টাও অত্যধিক উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিয়াছে। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একটী মাত্র দিন অবস্থান করিয়া গতকল্য এখানে এই পল্লীর ছোট-বড় সকল রমণীদের ভিতরে কি অপূর্ব্ব প্রেরণা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্তা হিরণপ্রভা ত্ত সেই কাহিনীও প্রেমাশ্রু-নয়নে বিবৃত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—জানিস্, স্ত্রীলোকেরাই স্ত্রীলোকের বড় শত্রু? স্ত্রীলোকের উন্নতিপথের বেশীর ভাগ বিঘ্ন স্ত্রীলোকেরাই সৃষ্টি করেছে। তুই স্ত্রীলোক হ'য়েও যখন সাধনার কাজের এত প্রশংসা কচ্ছিস, তখন বুঝ্‌তে হবে যে, দেশের হাওয়া ফিরেছে। তোদের ভিতর থেকে আজ প্রাচীনযুগের মহীয়সী মহিলারা পুনরাবির্ভূত হবেন। সেই গার্গী, সেই মৈত্রেয়ী, সেই বিশ্ববারা

নূতন ক'রে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি কর্ব্বেন, নূতন ক'রে বেদমন্ত্র রচনা কর্ব্বেন, নূতন ক'রে মানব-সমাজকে শক্তির মন্ত্রে, ভক্তির মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে, তপস্যার মন্ত্রে দীক্ষিত কর্ব্বেন। ভারতের নারী-জাতির নবজাগরণের যুগ এসেছে।

স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ ও সভ্যতা

সন্ধ্যার সামান্য পরে ভিন্নগ্রামবাসী এক যুবক শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ-সমীপস্থ হইয়া তাহার বিষাদময় জীবনের দুঃখ-কাহিনী বলিতে লাগিল। কাহিনীগুলি প্রধানতঃ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ বাবা, বিবাহের মত এমন একটা গুরুতর ব্যাপার মনুষ্য জীবনে আর নেই। মানুষ যদি সভ্য না হ'ত, তবে এটা তেমন গুরুতর কিছু হ'ত না। যার যাকে পছন্দ হ'ল না, সে তাকে ছেড়ে চ'লে গেলেই চুকে গেল। মানব-সভ্যতার দানা বাঁধবার আগটাতে ছিল ঠিক্ এই অবস্থাটা এবং মানব-সভ্যতা যে সব দেশে নীচ-নিকৃষ্ট যৌন ভোগতৃষ্ণার মধ্যে এসে আত্মহত্যা কত্তে উদ্যত হ'য়েছে, সেই সব দেশে এই অবস্থাটাই ফিরে আস্‌বার চেষ্টা কচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, মানবের যে সমাজ, তার পত্তনের গোড়ার সূত্র হচ্ছে স্বামী আর স্ত্রী। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সম্বন্ধটাই গোড়ার সম্বন্ধ এবং এই সম্বন্ধকে ঘিরেই অপর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, বিস্তার বা সঙ্কোচ ঘটেছে। স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা বজায় রাখ্‌তে হবে ব'লেই তুমি অন্য নারীতে প্রেম নিবেদন কত্তে পার না। স্বামীর সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ অটুট রাখ্‌তে হবে ব'লেই স্ত্রী অন্য পুরুষে প্রেম নিবেদন কত্তে পারে না। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যে সম্পর্ক, পবিত্রতার হিসাবে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ তার ঠিক্ পরেই আসন পাবে।

দাম্পত্য-জীবন ও শ্রদ্ধাবুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অবিচ্ছেদ্য করেছিলেন, তার প্রধান কারণ এই যে, এর চেয়ে বড় সম্বন্ধ যেন জগতে আর কিছু না থাকে। স্বামী জান্‌বেন স্ত্রী দেবী-প্রতিমা, স্ত্রী জান্‌বেন স্বামীকে দেব-বিগ্রহ, একের প্রতি অপরের থাক্‌বে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবুদ্ধি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি এবং এই শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই তাঁদের সর্ব্বপ্রকার আদান-প্রদান হবে নিখুঁত, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক। স্বামী ও পত্নীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গত সহযোগ আছে, কিন্তু এই শ্রদ্ধা সেই জান্তব মিলনকে বৃহত্তর দৈবী অনুভূতি লাভের পথে টেনে নিয়ে যায়, কলুষ-পল্বলে চিরতরে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে দেয় না। এই আদর্শের প্রেরণায় বিবাহকে বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার অতীত তাঁরা করেছিলেন।

বিবাহ তথা লটারি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বিবাহ একটা লটারীর মত ব্যাপার। কার সঙ্গে যে কার বিবাহ হবে, কেউ জানে না। কার সাথে বিবাহের ফলে যে কত সুখ আর কত দুঃখ, কত সমৃদ্ধি আর কত বিপত্তি হয়ে যাবে, কেউ বল্‌তে পারে না। রূপ দেখে, গুণ দেখে, বংশ দেখে, স্বাস্থ্য দেখে, বিদ্যা দেখে, সকল বিষয় যাচাই ক'রে যাকে ঘরে আন্‌লে, দুদিন পরে দেখা গেল, সে যোগ্যা পত্নী নয়। যার রূপ খুব অনিন্দ্য দেখে পছন্দ করেছ, তারই হয়ত এমন একটা গুপ্ত ব্যাধি বেরিয়ে পড়্‌ল, যা একেবারে চিকিৎসা-বিস্তার পরিধির বাইরে। যার বংশ খুব ভাল দেখে আদর ক'রে ঘরে আন্‌লে, তারই গৃহের গোপন ইতিহাস থেকে এমন কদর্য্য কাহিনী হঠাৎ বেরিয়ে পড়্‌ল, যা

আলোচনারও সম্পূর্ণ অযোগ্য। যার অটুট স্বাস্থ্য দেখে বরণ ক'রে ঘরে তুলেছ, তার হয়ত নিত্য মাথাধরা অথবা সপ্তাহে তিনবার ক'রে হিষ্টিরিয়ার ফিট্ একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম। যার বিস্তার বহর দেখে লুফে এনেছ, তার হয়ত গর্ব্ব, দুর্বিনয়, দুর্ব্যবহার, দুঃশীলতা, কলহপরায়ণতা তোমার জীবনকে তিক্ত, বিষাক্ত ও বহনের অযোগ্য ক'রে দেবে। বিবাহ এমনি এক লটারী। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার বলেছেন,—"Hanging and wiving go by destiny অর্থাৎ কার যে কোথায় ফাঁসী হবে, আর কার যে কোথায় বিয়ে হবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে অদৃষ্টের উপর।" যতই তুমি ভাল ক'রে বাছ-বিচার কর, এক্ষেত্রে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই ক'রে জিতে যাওয়া অসম্ভব। একটা বউ পছন্দ হ'ল না, আর একটাকে বিয়ে কর্লে, কিন্তু সেটা যে কার্য্যতঃ আরো অপছন্দের হ'য়ে দাঁড়াবে না, তা কে বল্‌তে পারে? স্ত্রীর একটা পা খোঁড়া ব'লে তুমি হয়ত আর একটা বিয়ে কর্‌লে, কিন্তু ছমাস না যেতেই হয়ত ধরা পড়্‌বে যে, দ্বিতীয়া বধূটীর একটা চোখ কাণা। তখন কি কর্‌বে? আবার আর একটা বিয়ে ত? কিন্তু তৃতীয় বধূটী যে নিদারুণ হৃৎপিণ্ডের রোগ নিয়ে তোমার ঘরে ঢুক্‌বে না, তার নিশ্চয়তা কি? স্ত্রী বন্ধ্যা ব'লে পুনর্দারপরিগ্রহ হ'ল, কিন্তু সন্তান হ'ল না। আবার বিয়ে করা হ'ল, এবারও সন্তান হ'ল না। পর পর তিনটী বিয়ে ক'রেও সন্তানের মুখ দেখা গেল না, এমন বিবাহিতের দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। বিবাহ একটা আশ্চর্য্য ভাগ্য-নির্ণয়। হাজার চেষ্টা কর, ফলাফলের উপরে তোমার কিছুই হাত নেই।

দাম্পত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এজন্যই বিবাহের মত ব্যাপারে চাখাচাখির প্রবৃত্তিটা ভাল নয়। একটার পর একটা ক'রে মেয়ে এনে বিয়ে কচ্ছ

আর চেখে চেখে যখন অপছন্দ হচ্ছে, তখন সেটীকে গৃহের দাসীবৃত্তির জন্যে আলগা ক'রে রেখে নূতন আর একটী মেয়েকে বিয়ে কচ্ছ,—এ বুদ্ধি অতি বিপজ্জনক ও পাপাত্মক। বিপদ হচ্ছে সতিনী-কলহের, পাপ হচ্ছে বহু-সংসর্গের। একটী পুরুষ বহু নারীর সংসর্গ কর্ব্বে, এটা সভ্য আদর্শের বিরোধী। তুমি যদি চেখে চেখে বেড়াও, তবে তোমার স্ত্রীরা সে কাজ কর্লে কী দোষ হবে? এক স্বামীর যদি বহু পত্নী থাক্‌তে পারে, তবে তিব্বতীদের মত এক নারীর বহু স্বামী কেন থাক্‌বে না? কৃষ্ণ, দশরথ প্রভৃতির বহু পত্নী ছিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তের জোরে যদি তোমরা অনেক বিবাহ কর, তা'হলে দ্রৌপদীর যে পঞ্চস্বামী ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তোমাদের স্ত্রীরা প্রত্যেকে পাঁচটী ক'রে স্বামী কর্‌বেন না কেন? সুতরাং ঐ যুক্তিকে বর্জ্জন কর। তুমি যে নির্দ্দিষ্ট একটা বংশে এসে জন্মেছ, এটা যেমন মেনে নিচ্ছ, বিবাহটাকেও ঠিক্ তেমনি মেনে নাও। তুমি একজন শূদ্রের ঘরে না জ'ন্মে যদি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাতে, একজন দরিদ্রের ঘরে না জ'ন্মে যদি একজন বড়লোকের ঘরে জন্মাতে, তা'হলে কতই না ভাল হ'ত! ভাল ত' হ'ত, কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা' ত' আর বদলান যাচ্ছে না। সুতরাং নিজের জন্মটাকে মেনে নিয়েই তোমাকে চল্‌তে হচ্ছে। শূদ্রের বা দরিদ্রের সন্তান হ'য়েও জীবনকে কতটা মহৎ করা যায়, সে চেষ্টাই তোমাকে কত্তে হবে। ঠিক্ তেমনি বিবাহ যার সাথে হয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে সেই সম্বন্ধটা পূর্ণরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েই চল্‌তে হবে। বিবাহের আগে বাছ-বিচার যত পার কর, কিন্তু বিবাহের পরে আর এই সম্বন্ধকে বা এই সম্বন্ধের দায়িত্বকে অস্বীকার ক'রো না, অস্বীকার কত্তে চেষ্টাও ক'রো না। স্ত্রী মূর্খ এসেছে, পার ত' তাকে বিদ্যা দান কর, নয়ত, এই মূর্খকে নিয়েই যতটা সুখে সম্ভব প্রীতি সহকারে

ঘরকন্না কর। স্ত্রী রুগ্না এসেছে, রোগারোগ্যের ব্যবস্থা কর, কিছুতেই রোগ না সারে ত' এটা তোমার অপরিহার্য্য নিয়তি ভেবে প্রসন্ন চিত্তে মেনে নাও। নারী-পুরুষের আদান-প্রদান ব্যাপারে স্ত্রী অশক্তা? বেশ, মনকে শক্ত কর এবং নিজেকে দেহ-সুখে চিরবঞ্চিত রেখেই বীরের মত স্ত্রীকে চিরসঙ্গিনীরূপে চালিয়ে নাও। লক্ষ লক্ষ স্ত্রী আছেন, যাঁরা নিজ নিজ স্বামীর ইন্দ্রিয়গত অক্ষমতার সকল ত্রুটীকে শান্ত চিত্তে মেনে নিয়ে নীরবে স্বামীর সেবাতেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। খবরের কাগজে তাঁদের নাম বেরোয় না। এমন স্বামীও দু-চার হাজার আছেন, যাঁরা এসব ক্ষেত্রে দারান্তর পরিগ্রহণের কল্পনা মাত্র না ক'রে অযোগ্যা স্ত্রীকেও প্রেম-ভরে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সেবাই এঁদের জীবনের মহান্ গৌরব। ভোগই জীবনের সব কিছু নয়, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই সেবাপরায়ণতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মহিমা।

দাম্পত্য-ব্যর্থতা ও সন্তোষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভোগবাদ দেশকে আচ্ছন্ন করেছে। দেবতার মত মানুষ তার ফলে নারকী পিশাচে পরিণত হয়েছে। মানবের সাধারণ জীবনে যৌন ভোগ-সুখের প্রয়োজন আছে। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সংযোগ কেবলি তাদের ব্যক্তিগত সুখের হেতু নয়, পরস্পরের প্রতি প্রেমবর্দ্ধনেরও সাধক। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে তার জন্যও সম্মানজনক স্থানকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কিন্তু যাকে ভগবান্ বিবাহ করিয়েও এই সুখের সুযোগ দিলেন না,—স্ত্রীর বা স্বামীর দিলেন রোগ, দিলেন ইন্দ্রিয়গত অযোগ্যতা বা অপর কোনও অকল্পনীয় অসম্পূর্ণতা,—তার পক্ষে সুখের জন্য পৃথিবী চুঁড়ে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। তার কর্ত্তব্য, ভগবান্ যে অবস্থাটী দিয়েছেন, তাকেই মেনে নিয়ে তারই মধ্য দিয়ে নিজেকে যতটা সম্ভব

ভগবানের কাজে লাগান। দাম্পত্য জীবনে সন্তোষের চেয়ে আর বড় কিছু সুখ নাই। সন্তোষ অসহনীয় মনোবেদনারও লাঘব করে।

ভগিনী হিরণপ্রভার কীর্ত্তনানুরাগ

শ্রীশ্রীবাবার ভ্রমণ-সঙ্গীরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মালাখালা হইতে দৌলতপুর প্রায় সাত মাইল। আসিতে হইয়াছে পুরা মধ্যাহ্ন কালটায়। তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রসাদ পাইয়া এখনি শুইয়া পড়েন। ভগিনী শ্রীযুক্তা হিরণপ্রভার একান্ত ইচ্ছা যে, গ্রামবাসীরা হরি-ওঁ কীর্ত্তনের মধুর নিনাদে নবজাগরণের উন্মেষ অনুভব করুন, ভক্তেরা এমন কীর্ত্তন করুন যেন সমগ্র গ্রামের প্রাণে উল্লাসের উদ্বেল তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, কণ্ঠে কণ্ঠে হরি-ওঁ কীর্ত্তন উত্থিত হউক, প্রাণে প্রাণে হরি-ওঁ গানের মধুর সুর-লহরী প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু পরিশ্রান্ত ভক্তেরা অত রাত্রিতে কীর্ত্তন সুরু করা সম্ভব মনে করিলেন না। স্থির হইল, পরদিন প্রাতে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া কীর্ত্তন হইবে। শিবপুর হইতে কীর্ত্তনজ্ঞ ভ্রাতা মাখন লাল ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণের সঙ্গ লইয়াছিলেন। কীর্ত্তন পরিচালনের নেতৃত্ব তাঁহার উপরে পড়িল।

প্রাণের কণ্ঠ

পরদিন, ৯ই পৌষ, প্রাতে নগরকীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পরে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান হইল। শ্রীশ্রীবাবা নিজে উপাসনা পরিচালন করিলেন। এই গ্রামে একমাত্র দিদি হিরণপ্রভা এবং তাহার স্বামী শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ব্যতীত আর কেহ শ্রীশ্রীবাবার উপাসনার সহিত পরিচিত নন। স্বামী বিদেশে। দিদি হিরণপ্রভা ইতঃপূর্ব্বে একবার মাত্র, নিজ

দীক্ষার কালে, গণেশপুর গ্রামে সমবেত উপাসনা দেখিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ-সঙ্গীয় ভক্তগণই প্রধানতঃ উপাসনার স্তোত্রকীর্ত্তনকারী।

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের কণ্ঠ চুপ্ থাক্‌লেও প্রাণের একটা কণ্ঠ আছে। গ্রামের যতগুলি পার সাত্ত্বিকবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীকে উপাসনার প্রাঙ্গণে বসিয়ে দাও। উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর তারা না জানে ত' চুপ্ ক'রে ব'সে মনপ্রাণ দিয়ে শুনুক। তোমরা যখন ভক্তি-ভরে ব্যাকুল কণ্ঠে স্তোত্র-ধ্বনি কর্ব্বে, তখন তাদের প্রাণের কণ্ঠ ফুটে উঠে ভাব-তরঙ্গে বল যোগাবে। কেউ স্তোত্র জানে না, কেউ বা সুর জানে না, তাই ব'লেই সে তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। কারো কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য নেই বা ছন্দ-লয়ের জ্ঞান নেই ব'লেই সেও তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় নয়।

সমবেত উপাসনার বিভূতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাদের সবাইকে ডাক, আদর ক'রে উপাসনার আসনে এনে বসাও, শুচিস্নাত দেহে, শুদ্ধ বস্ত্রে তারা এসে তোমাদের পাশে বসুক, তোমরা যে মধুর স্তোত্রাবলি উচ্চারণ কর, তার সাথে শুধু নিজ শ্রবণ-শক্তিটুকু দিয়ে তারা প্রেমপূর্ণ সহযোগ দিক্,—দেখ্‌বে, এতেই জগতে বিপুল মঙ্গলের আবর্ত্তন সৃষ্টি হচ্ছে। একজনকেও দূরে থাক্‌তে দিও না, সবাইকে এনে একত্র কর, নামে প্রেমে আবদ্ধ কর। দ্বিজ-চণ্ডালের বিচার নেই, সে শুধু কাণে শুন্‌তে পায় কিনা, এইটুকুই দেখ। পবিত্র ওঙ্কার-ধ্বনি সে শুনুক, পবিত্র গায়ত্রী-মন্ত্র তার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করুক, তাতেই সে নিজের ইচ্ছার অজ্ঞাতসারে নিখিল জগতের পরম কুশলের পথে নিজেও হবে ধাবিত, অপরকেও দেবে প্রেরণা। সমবেত উপাসনার এইটী হচ্ছে একটী অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি।

আত্মোৎসর্গের সাধনা

উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা একটী উপদেশ-ভাষণ প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার জীবনের চরম সার্থকতা ভগবৎ-পাদপদ্মে সম্যক্ আত্ম-বিসর্জ্জনে, নিজস্ব সত্তার দায়িত্ব নিজের উপরে রেখো না, কর অর্পণ ভগবানে। নিজের নিজত্বকে পূরাপূরি ভগবদভিপ্রায়ের চরণে উৎসর্গ ক'রে দাও। এর ভিতরে কোনো সর্ত্ত রেখো না, চুক্তি রেখ না, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বলতা রেখ না, সকল কামনা সকল লালসা সকল প্রার্থনা পরিহার ক'রে সবল প্রাণে নিজেকে উৎসর্গ কর। কামনার ভারবাহী প্রাণ বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই কুণ্ঠিত, কামনা-বর্জ্জিত প্রাণ বড়ই বলীয়ান্ এবং একেবারে দ্বিধাহীন। দ্বিধাহীন বলীয়ান্ প্রাণে নিজেকে উৎসর্গ কর। তার ভিতর দিয়েই তোমার সত্যজীবনের স্ফূরণ হবে।

তোমার মতন আপন নাই

উপাসনান্তে বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারীর দীক্ষা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে পরম পবিত্র অখণ্ড-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে, জান্‌বে, এই মন্ত্র তোমার প্রাণ-সর্ব্বস্ব। মনে মনে অবিরাম স্মরণ কর্ব্বে,—হে মহামন্ত্র, তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব, তোমার চেয়ে আপন আর আমার কেউ নেই, তোমার চেয়ে হিতকারী বান্ধবও আমার আর কেউ নেই, তুমি আমার সর্ব্বক্ষণের সহায়ক, সর্ব্বক্ষণের রক্ষাকর্ত্তা। মনে মনে অবিরাম বল্‌বে,—জগতের সকল প্রিয় বস্তু ক্ষণকালের প্রিয়, তুমি আমার চিরপ্রিয়। বারংবার এ কথা বলতে বলতে দেখ্‌বে, সত্যই নামকে তোমার একান্ত প্রিয়বস্তু ব'লে নিজেই আস্বাদনে টের পাচ্ছ। নাম যদি টক্ লাগে, তবু বল্‌বে,—হে নাম, তুমি আমার পরমপ্রিয়। নাম যদি তেঁতো লাগে, তবু

বল্‌বে,—হে নাম, তুমি আমার পরমপ্রিয়। নাম যদি বিরস ও বিরক্তি-জনক লাগে, তবু বল্‌বে,—হে নাম, তুমিই আমার প্রাণসর্ব্বস্ব। দেখ্‌বে, বিরসতা, বিরক্তি, অরুচি, বিস্বাদতা সব ক্রমশঃ দূর হ'য়ে যাচ্ছে এবং সত্য সত্যই পরম মধুময় ব'লে উপলব্ধ হচ্ছে। তখন দেখ্‌বে, নামে বস্‌লে পৃথিবী ভুল হ'য়ে যায়, একমাত্র নামকেই পরম প্রেমভরে দিবানিশি আলিঙ্গন ক'রে প্রাণে ধ'রে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। তখন প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে বলে,—"তোমার মতন আপন নাই।"

জননী আমার

আহারের পরে শ্রীশ্রীবাবা উপাসনা-প্রাঙ্গণে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন, সুকণ্ঠ গায়ক মাখন দাদা গান করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবা গান শুনিতেছেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে নানাস্থানে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাদের প্রথম পংক্তির ভোজন শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা উড়িশ্বর রওনা হইবেন।

গানের পর গান চলিতেছে, হঠাৎ মাখনদা গান ধরিলেন,—

জননী আমার,
　　জননী আমার!
কি মধুর নাম তব
　　কি কহিব আর!
স্মরণে পরাণ জাগে
　　অরুণ-কিরণে,
মলয়া পরশি' যায়
　　সারা দেহ-মনে,

ভুলে যাই অতীতের
যত হাহাকার !
জননী আমার !
প্রেমের আকর তুমি
মধুর নিলয়,
তাই বুঝি তব নাম
প্রেম-মধুময়,
নিমেষে হরিয়া লয়
যত দুখ-ভার,
অলখে মুছিয়া দেয়
নয়নের ধার।
জননী আমার !

মাখনদা গাহিয়া চলিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীবাবার নিস্পন্দ নিস্পলক চক্ষু হইতে অবিরাম ধারে অশ্রু বহিতেছে। এক বার, দুইবার করিয়া মাখনদা দশ বারো বার গানটী গাহিলেন। তারপরে থামিলেন। ভাবের জমাট যেন চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ধরিয়াছে, কাহারো মুখে বাক্‌স্ফূর্ত্তি নাই।

চিরসুন্দর

কিছু কাল পরে শ্রীশ্রীবাবা প্রশ্ন করিলেন,—এ গানটা কার রচনা হে !

মাখন।—আপনারই ত' বাবা !

শ্রীশ্রীবাবা।—আমার লেখা এত সুন্দর ?

মাখনদা হাসিয়া বলিলেন,—আপনি নিজে সুন্দর ত' আপনার লেখা সুন্দর হবেনা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ, মঙ্গলময় শ্রীভগবানই চিরসুন্দর। তাঁর দিকে তাকাও, তাঁকে ভালবাস।

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা পুত্র-কন্যাদের অশ্রু-বিসর্জ্জনের মধ্যে উড়িশ্বর যাত্রা করিলেন।

উড়িশ্বর ও গোবিন্দপুর

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীবাবা উড়িশ্বর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠকুমার ভৌমিকের বাড়ী পৌছিলেন। সকল স্থানের ন্যায় এইখানেও শ্রীশ্রীবাবাকে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভ্রাতা মাধব চন্দ্র ভৌমিকের যত্নে, পরিশ্রমে, ব্যয়ে ও ঐকান্তিকতায় সকল ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। প্রায় একমাইল দূর হইতে কীর্ত্তন-সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিলেন। পল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী শোভা-যাত্রা ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল এবং ভৌমিকবাড়ীর নিকটবর্ত্তী ময়দান হইতে বালক ও বালিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে, পুষ্প, মালিকা ও লাজবর্ষণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। যুগপৎ শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টা-নিনাদ ও উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মন্দ্রিত হইতে লাগিল।

মহাপুরুষ-সঙ্গের ফল

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী একদিন আগেই উড়িশ্বর পৌছিয়া-ছিলেন। তাঁহাকেও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অমৃতমাখা উপদেশ বাক্যে এখানকার মহিলা-সমাজে পাষাণ-

ও গলাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গেল। পূজনীয়া সাধনা দেবী গতকল্য উড়িষ্যরের মহিলাদের সমক্ষে দুইঘণ্টাব্যাপী যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নরূপ।

"জননী এবং ভগিনীগণ, আমি এসব অঞ্চলে আর কখনো আসিনি। আপনাদের কারো সাথে আমার কোনো পূর্ব্বপরিচয় নেই। এ অঞ্চলের দু-চার জন ভ্রাতার সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রে যা পরিচয়, তার ভিতরে আমার এমন কোনো সেবা বা ত্যাগ নেই, যাতে আপনাদের নিকটেও পরিচয়ের কোনো দাবী রাখ্‌তে পারি। কিন্তু অপরিচিতা আমাকে আপনারা চিরপরিচিতার ন্যায় গভীর প্রেমসহকারে গ্রহণ করেছেন। তার ভিতর দিয়ে আমি অনুভব কত্তে পেরেছি যে, আপনারা শ্রীশ্রীবাবাকে কত ভাল-বাসেন, কত ভক্তি করেন, কত আপন ব'লে জ্ঞান করেন। তাঁকে ভাল-বাসেন ব'লেই তাঁর শ্রীচরণের একটী নগণ্য ধূলিকণা আপনাদের এত আদরের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আপনারা ধন্য। সত্যই তাঁরা ধন্য, যাঁরা ত্রিলোকপাবন মহাপুরুষদের চিন্‌তে পারেন, তাঁদের জগন্মঙ্গল-যজ্ঞের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারেন, তাঁদের প্রতি প্রাণের অকপট ভক্তি নিবেদন কত্তে পারেন, তাঁদের ভালবাস্‌তে পারেন। বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্যের মধ্য দিয়ে নয়, পরন্তু একান্তই সরল সহজ সাধারণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীবাবা যে অতিমানব প্রতিভার বিকাশ করেছেন, এমন সুদূর পল্লীতে বাস ক'রেও আপনারা তা জেনেছেন, বুঝেছেন, তার উপরে ধ্যান দিয়েছেন, তাকে চিরমঙ্গলপ্রদ ব'লে ভেবেছেন, এটা আপনাদের পক্ষে এক মহাপ্রশংসার কথা। সাধারণ লৌকিক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তিনি যে অলৌকিক দৈব-প্রভাব দেশ, জাতি এবং জগতের উপরে বিস্তারিত করেছেন, আপনাদের আবেগবিহ্বল ভক্তিমধুর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে তার পরিচয়

পাচ্ছি। আপনাদেরই ন্যায় যেদিন ভারতের প্রতি পল্লীর প্রতি নারী শ্রীশ্রীবাবাকে চিনতে পার্ব্বেন, সেদিন এক অত্যাশ্চর্য্য সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। জ্ঞানের বিকাশই সত্যযুগের বিকাশকে সম্ভব করে এবং শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র জীবন অজ্ঞানের তিমিরান্ধতা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা বিদূরিত করে।

"শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ-সঙ্গ জীবকে দেয় আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্ভ্রম, নিজ ভবিষ্যতে দেয় প্রাণভরা আস্থা। আমি নিজ জীবনে তা উপলব্ধি করেছি। একটী দিন যে শ্রীশ্রীবাবার চরণ-সঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছে,—দীন হোক্, হীন হোক্, নগণ্য হোক্, পতিত হোক্, অনাথ হোক্, অধম হোক্—সে ঐ একটী দিনের ভিতরেই একথা উপলব্ধি কত্তে সমর্থ হয়েছে যে, জগতে তার করণীয় কিছু সত্যই আছে, ব্যর্থ-জীবন যাপনের জন্যই সে জন্মগ্রহণ করে নাই, চিরদুর্ব্বলের অক্ষম ক্রন্দনই তার একমাত্র সম্বল নয়, তারো পানে জগ-তের শত সহস্র অনাথ, শত সহস্র নিরাশ্রয় একটু সাহায্যের, একটু সেবার জন্য কাতর নয়নে তাকিয়ে থাকে। বৃথাই তার জীবন যাবে না, যেতে পারে না, তার জীবনেও করণীয় কাজ আছে, পালনীয় ব্রত আছে, উদ্‌যাপনীয় যজ্ঞ আছে; তারও জীবনের লক্ষ্য আছে, সেও জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সে জগতের হীন আবর্জ্জনা নয়। মহাপুরুষদের সঙ্গের এইটী হচ্ছে একটী প্রত্যক্ষ ফল, একটী অমোঘ লভ্য।"

নারীর জীবনে আত্মবিশ্বাস

পূজনীয়া সাধনা দেবী বলিলেন,—"নারীজাতি নিজেদের কত ঘৃণ্য, কত নিকৃষ্ট ব'লে মনে করে। শ্রীশ্রীবাবা বজ্রকণ্ঠে বলেছেন,—সে নীচ নয়, সে নিকৃষ্ট নয়। যত রমণী শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র চরণ দর্শন করার সুযোগ

পেয়েছে, সকলের মনে তিনি এই বিশ্বাসই জাগিয়ে দিয়েছেন যে, নারী নিকৃষ্ট নয়, হীন নয়। সকল হীনতাবোধের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি তোমাদের জানাতে চান যে, অতীত ভারতের মহীয়সী মহিলাদের ন্যায় তোমরাও জীবনের প্রতিপদক্ষেপে মহত্ত্বের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সমূহ প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পার, প্রতিষ্ঠা ক'রে যাবে। কন্যারূপে তোমরা পিতার শুধু আনন্দই বর্দ্ধন কর্ব্বে না, গৌরবও বর্দ্ধন কর্ব্বে। ভগিনীরূপে তোমরা ভ্রাতার শুধু প্রীতিই বর্দ্ধন কর্ব্বে না, মহিমাও বর্দ্ধন কর্ব্বে। পত্নীরূপে তোমরা স্বামীর শুধু সুখবিবর্দ্ধনই কর্ব্বে না, বলবর্দ্ধনও কর্ব্বে। মাতারূপে তোমরা সন্তান-সন্ততিকে শুধু স্নেহই বিতরণ কর্ব্বে না, ত্যাগের অমৃতরসও পান করাবে। তোমাদের দেহে, মনে, প্রাণে দেবীত্বের এক নববিকাশ হবে। অন্ধকার জগতে তোমরা আলোক-স্বরূপা হবে। হতাশ বিবশ মনে তোমরা উৎসাহের বিদ্যুৎ-সঞ্চারিকা হবে। পাপ এবং অসত্যের তোমরা দমন-কারিণী হবে। মিথ্যা এবং ব্যভিচারের তোমরা মৃত্যুদণ্ড-বিধাত্রী হবে। একদিকে স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, অপর দিকে নৃমুণ্ডমালিনী রণকালিকা, এই দুই মূর্ত্তিতে তোমরা যুগপৎ আবির্ভূত হবে এবং জগতের মঙ্গল বর্দ্ধন ও অমঙ্গল মর্দ্দন কর্ব্বে। ভাবী নারীর এই মহিমাময়ী মূর্ত্তি শ্রীশ্রীবাবা তাঁর কল্পনার আলেখ্যে অঙ্কন ক'রে রেখেছেন। সেই কথাই আজ তোমাদের শুনাতে এসেছি জননী আর ভগিনীগণ, আমার নিজস্ব কোনও কথা নেই।"

ইহার পরে কুমারীর কর্ত্তব্য, সধবার কর্ত্তব্য, বিধবার কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বহু উপদেশ পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী প্রদান করেন।

সমবেত উপাসনার অসাম্প্রদায়িকতা

পরদিন, ১০ই পৌষ, প্রাতে উঠিয়াই দেখা গেল, শ্রদ্ধেয় ভক্তদাদা স্থানীয় এবং দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত যুবকদের লইয়া সমবেত উপাসনার উপযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিলেন,— সমবেত উপাসনার কত রকমের পদ্ধতি আমি কত সম্প্রদায়ের ভিতরে দেখেছি, কিন্তু অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের অনুষ্ঠিত এই সমবেত উপাসনার মত এমন অসাম্প্রদায়িক উপাসনা আর দেখিনি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কোনো সম্প্রদায়ের লোকই এর ভিতরে এক কণা আপত্তিকর জিনিষ পাবেন না। ব্রাহ্মরা গুরু মানেন না, তাই সদ্‌গুরু-বন্দনা হয় ব'লে হয়ত আপত্তি ক'রে বস্‌তে পারেন। কিন্তু আপত্তি হ'তে না হ'তেই তা মিটে যাবে, কেন না, ততক্ষণে স্তোত্রোচ্চারণ সুরু হবে "জয় ব্রহ্ম-গুরু।" সাকারবাদীরাও এসে আপত্তি তুল্‌তে না তুল্‌তেই দেখ্‌বেন যে, ওঙ্কার-বিগ্রহ ব'সে আছেন সকল বিগ্রহের সমন্বয়-রূপে,—"ভেদবুদ্ধের্বিমর্দ্দকম্‌।" সকল ভেদবুদ্ধি এতে দূর হয়ে যাচ্ছে। শাক্ত-বৈষ্ণবের লাঠালাঠি আর শৈব-ব্রাহ্মের মারামারি নিরসনের এমন আর একটী পথ আর কেউ দেখাতে পারেন নি। ধন্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব! আমি তাঁর চরণে কোটি কোটি বার প্রণিপাত করি। জানো, আমি হরিদ্বারের মণ্ডলেশ্বর স্বামী ভোলানন্দ গিরি পরমহংস মহারাজের শিষ্য? আমি আমার সেই ত্রিকালদর্শী গুরুকে স্বরূপানন্দের ভিতরে নূতন ক'রে দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছি।

কেহই তোমার পর নহে

প্রাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আট ঘটিকায় উড়িশ্বরে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান

হইল। অদ্য উপাসনার জন্য একটী বিশেষ দিন ছিল। এই দিনটীতে সর্ব্বত্র সকলে নিজ নিজ স্থানে সর্ব্বজীবহিতার্থে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক্ একই সময়ে একটী করিয়া সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবা সর্ব্বত্র দিয়া রাখিয়াছিলেন। উপাসনায় বসিবা মাত্রই প্রত্যেকের অনুভূত হইতে লাগিল যেন, শত শত মাইল দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের উপাসকেরা এক হইয়া গিয়াছেন, সকলের সকল দূরত্ব যেন দূর হইয়া গিয়াছে, আর সমবেত সকলের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ যেন এক হইয়া আনন্দ-গম্ভীর প্রশান্ত রবে উচ্চারণ করিতেছে,—"বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্গুরুম্"।

উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবা একটী সুন্দর উপদেশ-ভাষণ প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের বিমল বিভা তোমাদের মনের সকল অজ্ঞানতার তমসা বিদূরিত করুক। তোমরা সেই আলোকে আত্ম-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ কর, তোমরা সেই আলোকে স্পষ্ট দর্শনে সমর্থ হও যে, জগতের সকলকে নিয়ে তোমার তুমিত্ব, তোমার অস্তিত্ব। সকলের সাথে তোমার যে প্রেমের মোহন সম্বন্ধ রয়েছে, প্রজ্ঞার আলোকে তা প্রত্যক্ষ কর এবং সকল দূরকে নিকট ক'রে, সকল পরকে আপন ক'রে জীবনের পরিপূর্ণতার মধুস্বাদ গ্রহণ কর।

নামই প্রেম ও সুখের আকর

বেলা পৌনে দশটায় দীক্ষার্থীদের দীক্ষা আরম্ভ হইল। আঠারো জন পুরুষ এবং নয় জন মহিলা অখণ্ড মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষাদানকালে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—মঙ্গলময় নামকে জানবে নিত্যপ্রেম এবং নিত্যসুখের মূল। ক্ষণিক প্রেম নয়, স্বল্প সুখ

নয়, অবিনশ্বর প্রেম আর সীমাতীত সুখ আসে নামের সেবা থেকে। নিত্যসুখ, সত্যসুখ, নিত্যপ্রেম, সত্যপ্রেম আসে নামের একনিষ্ঠ সেবা থেকে। তোমরা প্রেমিক হও, তোমরা সুখী হও, এই হচ্ছে তোমাদের জন্য আমার একমাত্র আশীর্ব্বাদ। অনন্ত-প্রেমের আকর হচ্ছে মঙ্গলময় নাম। অফুরন্ত-সুখের আধার হচ্ছে এই নাম। সুখ ছাড়া জীব বাঁচে কিন্তু জীবনকে দুর্ব্বহ মনে করে। প্রেম ছাড়া জীব কোনো অবস্থাতেই বাঁচে না। সেই সুখ আর সেই প্রেম তোমরা নামের খনি খুঁড়ে খুঁড়ে সংগ্রহ কর, নিজেরা লাভ কর, জগৎকে বিলাও।

পুরুষের দৃষ্টিকে শ্রদ্ধান্বিত কর

গোবিন্দপুর-গ্রামবাসিনী জননী-ভগিনীগণের একান্ত আগ্রহাতিশয্যে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী বেলা দশ ঘটিকার সময়ে গোবিন্দপুর গ্রামে গমন করিলেন। সেই গ্রামে তিনি যেই ভাষণ প্রদান করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। বক্তৃতা শেষ করিয়া ফিরিতে তাঁহার প্রায় দুইটা বাজিল।

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—প্রত্যেক নারীর চখের সামনে এই লক্ষ্যটী সুস্পষ্ট-ভাবে থাকা উচিত যে, তার নিজের ব্যবহারের দ্বারা যেন জগতের প্রত্যেক নারীর প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিকে সে শ্রদ্ধান্বিত কত্তে পারে। নারীমাত্রেই যে আজ পুরুষের দৃষ্টিতে রক্তপিপাসু পিশাচী এবং সর্ব্ব-কল্যাণনাশিনী, তার দোষ পুরুষের ঘাড়ে দিও না। একটী নারীর চরিত্র দেখে সমগ্র নারীজাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করা যদিও সঙ্গত নয়, কিন্তু মানুষের স্বভাবই হচ্ছে, হাঁড়ির একটী চাউল টিপে দেখে সব গুলি চাউল সিদ্ধ কি অসিদ্ধ বিচার করা। অসতর্ক, প্রগল্‌ভা, দুঃশীলা ও

চপলচিত্তা নারী নিজ ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্বারা পুরুষের মনে সমগ্র নারী-জাতি সম্পর্কে অতীব কদর্য্য এবং বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু আবার একটী মাত্র নারী নিজের চরিত্রের সৌন্দর্য্য, আচরণের পবিত্রতা, বাক্যের শুচিতা ও লক্ষ্যের উচ্চতা দিয়ে পুরুষ-সমাজের মনে সমগ্র নারী-জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উদ্দীপিত ক'রে দিতে পারে। একটী মাত্র নারীর ভিতরে এতখানি শক্তি আছে। সেই শক্তিকে সদ্‌ব্যবহারে আনো জননীগণ আর ভগিনীগণ। সেই ভ্রাতা পরমভাগ্যবান, যার ভগিনীকে দেখে পৃথিবীর মানুষ সকল নারীকে দেবী ব'লে পূজা কত্তে প্রলুব্ধ হয়। সেই পিতা পরমসৌভাগ্যশালী, যার কন্যাকে দেখে পৃথিবীর মানুষ নারীমাত্রকেই ভগবতী জ্ঞানে নত মস্তকে প্রণাম করে। সেই স্বামী পরম-শ্লাঘার আস্পদ, যাঁর পত্নীকে দেখে মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, স্বর্গের দেবীরই আর এক নাম এই মর্ত্ত্যের নারী, নারী নরকের অধিবাসিনী নয়, বিষ্ঠার কীট নয়। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের পবিত্রতার দীপ্তি দিয়ে পুরুষ মাত্রেরই মনকে পবিত্র কর, উন্নত কর, পুরুষের মনের কদর্য্য ধারণা, কলুষিত অনুমান দূর কর। নারী মাত্রেরই এইটী একটী মহৎ কর্ত্তব্য।

বজ্র-ভাষণ

অপরাহ্ন তিনঘটিকার সময়ে উড়িশ্বরের সভারম্ভ হইল। ভক্ত দাদা মিনিট চল্লিশ বক্তৃতাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার বজ্রভাষণ সুরু করিলেন। "বজ্রভাষণ" কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম। আজ শ্রীশ্রীবাবা মেঘমন্দ্রে যে বীর্য্য-বাণী বিতরণ করিতে লাগিলেন, একজন শ্রোতাও এমন আশ্চর্য্য, এমন অদ্ভুত, এমন অপূর্ব্ব শব্দ-সম্পদ জীবনে কখনও শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। হিমালয়ের

উচ্চ শৃঙ্গ হইতে যেন এক একটা বাক্য কঠিন কঠোর বরফের মত খসিয়া খসিয়া নামিয়া আসিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে জলের মত তরল হইয়া পবিত্র গাঙ্গ্য-প্রবাহে পরিণত হইয়া প্রত্যেকের শ্রবণ ও মন পবিত্র করিয়া চলিয়াছে। কঠিনের সহিত সহজের, জটিলের সহিত সরলের, দৃঢ়তার সহিত কোমলতার এইরূপ আশ্চর্য্য সমাবেশ আমরাও আর কখনো দর্শন করি নাই।

পাপের সাথে আপোষ করিও না

দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিল। বহু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সভাতে উপস্থিত ছিলেন। জনতা দুই সহস্রের নীচে হইবে না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ভিন্ন মত আর ভিন্ন পথের বিচার নিয়ে কেউ মারামারি ক'রে দুর্ল্লভ জীবনের স্বল্প-পরিসর সুযোগটুকু নষ্ট করো না। যে যেই পথে আছ, সে সেই পথে চ'লেই জীবনকে পূর্ণতাদানে বদ্ধপরিকর হও। কিন্তু মনে রেখো, ধর্ম্মের সাথে পাপের কখনো আপোষ হ'তে পারে না। যেখানে পাপের সাথে আপোষ আছে, জান্‌বে সেখান থেকে ধর্ম্ম ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছে। তুমি কতখানি পূর্ণ, তার বিচার হবে তুমি কতখানি পবিত্র, তা' দিয়ে। পবিত্রতাই ধর্ম্মের মাপ-কাটি, জীবনের পূর্ণতার মাপকাটি। সামাজিক কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার, প্রথাগত কুসংস্কার—সব কিছুর ঊর্দ্ধে স্থাপন কর তোমার পবিত্র ঈশ্বরানুরাগকে। কারণ, সমাজই বল, প্রথাই বল আর সম্প্রদায়ই বল,—সব কিছুর চেয়ে বড় হচ্ছেন পবিত্রতাস্বরূপ তোমার প্রাণের আরাধ্য শ্রীভগবান।

বৃন্দারামপুর ও কাশীপুর

পরদিন, ১১ই পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা সাত ঘটিকায় এক পাল্কীতে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী রওনা হইলেন কাশীপুর, অপর পাল্কীতে শ্রীশ্রীবাবা রওনা হইলেন বৃন্দারামপুর। ইহার পূর্ব্বে বাংলা ১৩২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া ১৩৪৬ সাল পর্য্যন্ত সতের বৎসরের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা বহুবারই ত্রিপুরার পল্লী-অঞ্চলে আসিয়াছেন এবং অসংখ্য গ্রাম ঘুরিয়াছেন। প্রত্যেকবার পদব্রজেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। কি কষ্ট সহিয়া তিনি কাজ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি ক্ষত-বিক্ষত চরণে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ক্লান্ত, ক্লিষ্ট শরীরেই প্রত্যেক গ্রামের করণীয় সেবায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কোনও ওজর দেখান নাই, কোনও আপত্তি করেন নাই। কেবলই কি তিনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন? নিজ হাতে কি মাটি কাটেন নাই, পুকুরের পানা সাফ করেন নাই, গ্রাম্য রাস্তা মেরামত করেন নাই, রাত্রি জাগিয়া গ্রাম পাহারা দেন নাই, সমগ্র দিন উপবাসী থাকিয়াও একই স্থানে একই দিনে তিনটী কেন্দ্রে তিনটী বক্তৃতা দেন নাই?

শ্রীশ্রীবাবা পাল্কী চড়েন কেন?

কিন্তু সেই সময়ে পূর্ব্ব হইতে ভ্রমণ-তালিকা নিরূপণ করিয়া কাজ করিবার প্রয়োজন ছিল না এবং সর্ব্বত্র ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ করিবার নিয়মও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর, বর্ত্তমান ভ্রমণে একই দিনের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন অংশ এমন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বণ্টিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটী কার্য্য সময়মত এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে পথশ্রমের

ক্লান্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বাহ্নেই নিজ শরীরের পরিমাপ অনুযায়ী একখানা সেগুণ কাঠের পাল্কী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং সেই পাল্কীতেই ভ্রমণ করিতেছেন। পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী কখনও শ্রীশ্রীবাবার অপ্রয়োজনের সময়ে শ্রীশ্রীবাবার পাল্কী ব্যবহার করেন, আর, প্রয়োজনের সময়ে পৃথক্ ভাবে সংগ্রহীত অন্য পাল্কীতে ওঠেন।

খিচুড়ী-মহারাজ

যাহা হউক, বেলা নয় ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা বুন্দারামপুর ভৌমিক বাড়ীতে পৌছিলেন। গ্রামটী ক্ষুদ্র। অখণ্ডভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল, শচীন্দ্রলাল, মনোমোহন ভৌমিক শ্রীশ্রীবাবার শুভাগমন উপলক্ষে যত দিক্ দিয়া যতটা সম্ভব সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থানের ন্যায় এখানেও খিচুড়ী-মহারাজের বিশেষ প্রাধান্য দেখা গেল। শ্রীশ্রীবাবার কিন্তু মত এই যে, উপাসনা-অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসভা এই দুইটীর সুচারু সুব্যবস্থার প্রতিই সকলের প্রখরতর দৃষ্টি রাখা উচিত।

এই সম্পর্কে একজনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথোপকথনও হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মসভা আরম্ভ হওয়ার সময়টা যদি এমন হয় যে, এই সময়ে সভায় যোগ দিতে হ'লে বাইরের লোকের পক্ষে আহারাদি সমাপন ক'রে আসা অসুবিধাজনক, তাহ'লে প্রত্যেক শ্রোতার জন্য খিচুড়ী-প্রসাদ রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। অথবা ধর্ম্মসভা শেষ হবার পরে যদি রাত্রি হয়ে যায় এবং শ্রোতৃবর্গের নিজগৃহে যাওয়া কষ্টকর, অসুবিধাজনক বা অসঙ্গত হয়, তবেও এই ব্যবস্থা রাখা উচিত। উপাসনা-অনুষ্ঠানের পরে চিরপ্রচলিত প্রসাদ হবে খৈয়ের মোয়া, নারিকেলের (অভাবে

তিলের) নাড়ু   যত ইচ্ছা দাও, যত ইচ্ছা পাও। যাদের জন্য অন্নব্যঞ্জন রা খেচরান্ন প্রসাদ না কর্লেও চলে, খামখা তাদেরও এনে অন্ন-প্রসাদের হাঙ্গামায় জড়ালে আসল অনুষ্ঠানের কোথাও না কোথাও ত্রুটী হবেই হবে। খিচুড়ীকেই উৎসবের প্রধান অঙ্গ জ্ঞান না ক'রে উপাসনার স্তোত্র-পাঠ ও সমবেত অঞ্জলি, হরিনাম কীর্ত্তন তথা জনসভায় ধর্ম্মমূলক বক্তৃতা শ্রবণের নিখুঁত সুব্যবস্থাকেই প্রধান অঙ্গ জ্ঞান করা উচিত।

খিচুড়ী বনাম ভাব-সম্মেলন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, একটা ক্ষেত্রে খিচুরী-প্রসাদ দেওয়া-নেওয়াকে একটা পরমলাভকর ব্যাপারে পরিণত করা যায়। সেইটী হচ্ছে, সবাই মিলে সব কর্ব্বে, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের একার উপরে চাপও পড়্বে না, দায়িত্বও থাক্‌বে না। যার যেখানে যা আছে ভোজ্যোপকরণ, সে সেখান থেকে তাই নিয়ে এসে একজনের গৃহে জমা কর্‌ল, সবাই তত্ত্বাবধান কর্‌ল, সবাই কাজ কর্‌ল, সবাই প্রসাদ দিল, সবাই প্রসাদ নিল, কণা কণা প্রসাদের ভিতর দিয়ে পুঞ্জীকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন ক'রে মহানন্দে সবাই ঘরে ফিরে গেল। অর্থাৎ, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের বিচারবর্জ্জিত এক জগন্নাথ-লীলার হবে পুনরাবৃত্তি এবং তার মধ্য দিয়ে সকলের লক্ষ্য থাক্‌বে নামে এবং প্রেমে এক হ'য়ে জীবে জীবে অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধন সৃষ্টি ক'রে এক অভিনব ভাবসম্মেলনের অনুষ্ঠান করা। কিন্তু তাতেও এরূপ শৃঙ্খলা রাখার খুবই প্রয়োজন আছে যেন, এর দরুণ উপাসনার ও সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথোচিত তৎপরতার সহিত কার্য্যারম্ভ কত্তে কোনো বাধা উপস্থিত না হয়।

নামই অমৃত

বৃন্দারামপুরে শ্রীশ্রীবাবার শুভাগমনের পর হইতেই অবিরাম হরি-ওঁ

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। বেলা দশ ঘটিকায় কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা দীক্ষার্থীর দীক্ষা হইল।

শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—মঙ্গলময় নামকে অমৃত-স্বরূপ জানবে। অমৃত হচ্ছে মৃতেরও নবজীবন দাতা, অমৃত হচ্ছে মধুস্বাদ সকল বস্তুর শ্রেষ্ঠ। এত মিষ্টি জগতে আর কিছু নেই। জানবে, নামের সেবা প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে নবজীবন দিচ্ছে, নবজীবনের অভিনব স্বাদ দিচ্ছে, নবজীবনের অধিকার দিচ্ছে। অমৃতস্বরূপ নাম পেয়েছ, আর নিজেকে মরণশীল ব'লে ভ্রম ক'রো না। তুমি অমর। তুমি জরামৃত্যুর অতীত। তুমি পূর্ণানন্দের আধার, তুমি পূর্ণ শক্তির উৎস। মনকে নিমেষের জন্যও দুর্ব্বল বা ম্রিয়মান হ'তে দেবে না। জানবে, ক্ষণস্থায়ী দুঃখ, বিপদ, অশান্তি এবং অশুভ তোমাকে পরাজিত কত্তে পারে না, তুমি যে অমৃতস্বরূপ অখণ্ডনামের সেবক!

নারী ও সমাজ

এদিকে বেলা এগারটায় পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী কাশীপুর গ্রামে পৌছিলেন। প্রায় অর্দ্ধমাইল দূর হইতে স্থানীয় যুবকেরা আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া নিয়া গেলেন। বেলা দুইটার সময়ে তিনি কাশীপুরে সমবেত একটী বিরাট মহিলা-সমাবেশে পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—সমাজের মূল কেন্দ্র হ'ল নারী! নারীকে বেষ্টন ক'রেই মানুষ তার সমাজকে রচনা করেছে। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ নেই। কেননা, নারীকে তাঁরা তাদের সংশ্রব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের পুত্র নেই, কন্যা নেই, পুত্র-কন্যার অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, বিবাহ প্রভৃতি নেই। নির্দ্দায়

একক তাঁদের জীবন। কিন্তু যারা গৃহত্যাগ কর্ল্লনা, নারীকে নিয়ে ঘর-সংসার সুরু কর্ল্ল, তারা তারই ফলে পেল শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্যালক, শ্যালিকা, সম্বন্ধী, ভায়রাভাই, তারা নারী থেকেই পেল পুত্র, পেল কন্যা, আবার তারই ফলে এল পুত্রবধূ, এল জামাতা, তারই ফলে পেল বৈবাহিক, বৈবাহিকা,— এভাবেই দেখ্তে না দেখ্তে একটী ব্যক্তি একটী পরিবারে এবং একটী পরিবার একটী সমাজে পরিণত হয়ে গেল। সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সমাজের মূল নারী, নারী ছাড়া সমাজ হয় না। কিন্তু মূলে যদি ঘুণে ধরে, পোকায় কাটে, ব্যাধি হয়, তাহলে কি সমাজ-বৃক্ষ বাঁচে? নারী যেখানে মানবী নামের অযোগ্যা, পিশাচী-চরিত্র-বিশিষ্টা, ঘৃণার্হ-জীবনা-যাপনকারিণী, সেখানে তাকে কেন্দ্র ক'রে যে সমাজ গ'ড়ে উঠেছে, তা কি নারকীদেরই সমাজ হবে না? স্ত্রী যদি তার স্বামীর মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে, সে পিশাচী ত' নয়ই, এমনকি মানবীও নয়, সে স্বর্গের দেবী, সে দৈববিভূতিভূষণা দেববালা, তার চরিত্র মহৎ, তার চিন্তা পবিত্র, তার লক্ষ্য স্বচ্ছ, তার উদ্দেশ্য নিষ্কাম, তা হ'লে তাকে কেন্দ্র ক'রে দিকে দিকে পবিত্রতার বিদ্যুৎ ছড়াতে থাকে। তাতে মানব-সমাজ নারকীর সমাজ না হয়ে হয় দেবতার সমাজে পরিণত। সমাজকে গড়ার আর ভাঙ্গার, রাখার আর নাশ করার দায়িত্ব, অধিকার এবং শক্তি তোমাদের। একথা না ভু'লে তোমরা নিজেদের জীবন আদর্শানুগ ভাবে গঠন কর। পৃথিবী শান্তি এবং পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ-হবে।

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় বৃন্দারামপুরের ধর্ম্মসভার কার্য্য সুরু হইল। প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রাতা কার্ত্তিক রঞ্জন মজুমদার অথবা মাখন লাল ভট্টাচার্য্য অখণ্ড-সঙ্গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিয়া থাকেন। এখানেও অখণ্ড-

সঙ্গীত প্রথমে গীত হইল। শ্রীশ্রীবাবা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

এতটুকু ক্ষুদ্র এক গ্রামে যে চতুর্দ্দিক হইতে এত জনতার সমাবেশ হইবে, ইহা কেহ মনে করিতে পারেন নাই। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আগ্রহভরে বক্তৃতা শুনিতে আসিলেন।

ভাণী সেবাশ্রমের শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার প্রথমতঃ অখণ্ড-সঙ্গীতের (অর্থাৎ খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড এই গানটীর) ব্যাখ্যা করিলেন। *

অতঃপর শ্রীযুক্ত ভক্ত দাদা এবং আমাদের একজন গুরুভ্রাতা বক্তৃতা দিলে পরে শ্রীশ্রীবাবার অমৃতসম উপদেশবাণী বর্ষিত হইতে লাগিল।

আত্মসমর্পণ কর

শ্রীশ্রীবাবা পৌনে দুইঘন্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। বলিলেন,—ইষ্ট-পাদপদ্মে আত্ম-বিসর্জ্জনই তোমার জীবনের পরম পুরুষকার, চরম সার্থকতা। বাইরের সব ভুলে যাও, অন্তরঙ্গ সাধনে তোমার প্রাণ-বল্লভকে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়ে আপন কর। যে দেয়, সেই পায়; না দিয়ে ত' পাওয়া যায় না! নিজেকে একেবারে নিঃশেষে তোমার পরম-দয়িতের পায়ে সঁপে দাও। রেখো না কোনও সর্ত্ত, ক'রো না কোনও চুক্তি, সর্ব্বস্ব দেবার বিনিময়ে কিছু পাবার প্রার্থনাও রেখ না।

---

* ১৪ই পৌষ মোচাগড়া আশ্রমে যে সভা হয়, তাহাতে পূজনীয়া সাধনা দেবী যে মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে এই গানটী সম্পূর্ণ দেওয়া আছে বলিয়া এখানে পুনরায় মুদ্রিত হইল না। এই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পরে তাহা দ্রষ্টব্য।

তাঁকে যে যা দেয়, সে তার কোটিগুণ পায়, না চেয়েও পায়, পাবার জন্য চাইতে হয় না। কিন্তু পাওয়া যে কিছু যাবে, সেই কল্পনাকে পর্য্যন্ত মনের আঙ্গিনায় ঢুকতে দিও না, নিজের সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে সমর্পণ ক'রেই কৃতার্থ হও। কত জন্ম ধ'রে তপস্যা ক'রে এসেছ, কিন্তু পূর্ণ আত্মদান কত্তে পেরে ওঠনি। একটুখানি স্বার্থ হ'লেও নিজের জন্য রেখেছ। সবখানি তাঁকে দিয়ে দিবে ব'লে অধ্যবসায় ক'রেও ছিচ্‌কে চোরের মত একটু খাম্‌চি দিয়ে তার ভিতর থেকে এক কণা স্বার্থ আল্‌গা ক'রে রেখে দিয়েছ। আজ কিন্তু নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিতে এসে সেই কণাও রাখার বুদ্ধি ক'রো না। নিজেকে দিয়ে দাও, একেবারে উজাড় ক'রে নিশ্চিহ্ন ক'রে নিঃশেষে দিয়ে দাও। জীবন তোমার তাতেই ধন্য হবে।

জ্ঞানের প্রচার

রাত্রিতে জনৈক জিজ্ঞাসুর সহিত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উচ্চনীচ, ধনি-দরিদ্র সকলের ভিতরে জ্ঞানের প্রচার কর। জান্‌বে, এটাই তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যার যেটুকু অবসর আছে, তারই সেইটুকু এই কার্য্যে নিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞানের প্রচার কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? যে যেমন ভাবে জীবন যাপন কচ্ছে, তাকে তার চেয়ে ভাল ভাবে জীবন যাপনের প্রেরণা প্রদানই জ্ঞানের প্রচার। যে যেভাবে চল্‌ছে, সে কি তার চেয়ে ভাল ভাবে চল্‌তে পারে না? তার চেয়ে মহৎ হ'তে পারে না? তার চেয়ে সুন্দর হ'তে পারে না? পারে, নিশ্চয় পারে। কেবল এই তত্ত্বটা প্রচার কর্‌লেই যথেষ্ট জ্ঞানের প্রচার হ'ল।

ধর্ম্ম ও দর্শন

অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দর্শনশাস্ত্র

সত্যের সন্ধান করে, আর ধর্ম্মাচরণ সেই সত্যকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দার্শনিক তত্ত্বালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে কিন্তু সত্যকে জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করাটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। এই জন্যই দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞানবর্জ্জিত একজন প্রকৃত সাধক পুরুষ আমাদের নিকটে অধিকতর আদরণীয়।

মুরাদনগর ও করিমপুর

১২ই পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা কাশীপুর রওনা হইলেন। মুরাদনগর বাজারে আসিয়া তাঁহাকে এক ভক্তের কাপড়ের দোকানে বসিতে বাধ্য করা হইল। মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই ভক্তির অধীন। থালায়-থালায় কমলা আসিতে লাগিল, শ্রীশ্রীবাবা মহানন্দে সকলকে প্রসাদ বিলাইতে লাগিলেন। সমগ্র বাজারটার মধ্যে যেন একটা আনন্দের হট্টরোল পড়িয়া গেল। স্থানীয় কাছারীর নায়েববাবুও তাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবাকে জোর করিয়াই লইয়া গেলেন। আনন্দের প্রাচুর্য্য সেখানেও কম হইল না।

আনন্দ-দানের ব্রত

উপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাচ্চা আনন্দ পাওয়া আর সাচ্চা আনন্দ দেওয়া, জীবনের এই হচ্ছে এক পরম কীর্ত্তি। তোমরা সবাই প্রতিজ্ঞা কর যে, জীবন ভ'রে চেষ্টা করবে, কে কত ভাবে কত জনকে সত্যিকারের আনন্দ-রসের আস্বাদন দিতে পার। বিষাদ-খিন্ন পৃথিবী আনন্দের কলরোলে পূর্ণ হ'য়ে উঠুক। তোমরা সবাই আনন্দ-দানের ব্রত অঙ্গীকার কর।

সত্যের সাথী

ঠিক এই সময়ে পূজনীয়া ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী করিমপুর গ্রামে

মহিলাদের সমক্ষে দুই ঘণ্টা কালব্যাপী একটী বক্তৃতা দানে ব্যাপৃত ছিলেন।

ব্রহ্মচারিণীজী বলিলেন,—জীবন তোমাদের সত্যেরই সেবার জন্য, সত্যেরই পূজার জন্য। সেই সেবা আর সেই পূজায় তোমাদের পুত্রকে, কন্যাকে, স্বামীকে, ভ্রাতাকে, পিতাকে, মাতাকে, শ্বশুরকে, শাশুড়ীকে, ননদকে, ননাসকে, দেবরকে, ভাজকে, সংসারের সকল আত্মীয়-পরিজনকে সাথী ক'রে নাও। নিজ জীবন থেকে মিথ্যাকে, অন্যায়কে, কদর্য্য অনুরক্তিকে নির্ব্বাসিত কর, আর, জীবন-পথের একজন সাথীও যাতে মিথ্যার পথে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা কর। তোমরা প্রত্যেকে জানো যে, তোমরা প্রকৃতই শক্তিহীনা নও। পরমেশ্বর তোমাদের ভিতরে প্রচুর শক্তি-সামর্থ্য দিয়েই তোমাদের এই জগতে পাঠিয়েছেন। জীবন-ভ'রে সাথী সংগ্রহ কর একমাত্র সত্যের, মিথ্যার নয়, আত্ম-প্রবঞ্চনার নয়।

কাশীপুর

মুরাদনগর হইতে শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। কাশীপুর, করিমপুর ও মধ্যনগরের যুবক ও প্রৌঢ়গণ মুরাদনগর হইতেই কীর্ত্তন সহকারে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিলেন এক সম্ভ্রান্ত সুকণ্ঠ সজ্জন, যিনি স্বদেশের সেবায় একান্ত নিয়োজিত বলিয়া বারংবার রাজরোষে পতিত হইয়াছেন এবং প্রতিবার উচ্চকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কারাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।

বাংলা ১৩৩৯ এর ২০শে ভাদ্র শ্রীশ্রীবাবা প্রথমবার কাশীপুরের অখণ্ড-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দে'র গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আজ সুদীর্ঘ নয়

বৎসর পরে দ্বিতীয়বার তিনি এই ভক্তগৃহে পদধূলি প্রদান করিলেন। হরিদাসদার পিতা মহিমবাবু শ্রীশ্রীবাবার পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহিমবাবু অতি উচ্চাঙ্গের ভক্ত ব্যক্তি।

পূর্ণোদ্যমে "হরি-ওঁ" কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এই গ্রামে বহু সুকণ্ঠ-ব্যক্তি আছেন, বুঝা গেল। কীর্ত্তনাবসানে জনৈক গুরুভ্রাতার পরিচালনে সকলে ভক্তিভরে অখণ্ড-বিগ্রহে অঞ্জলি দান করিলেন। বাতাসা-প্রসাদের লুট পড়িল।

নামে-মাত্র দীক্ষা নিও না

বেলা ১২টায় দীক্ষারম্ভ হইল। চতুর্দ্দশ জন পুরুষ এবং ষোড়শজন মহিলা অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা সকলকে বলিলেন,—বাছারা, শুধু নামে-মাত্রই একটা দীক্ষা নিলে চল্‌বে না। মনে রাখ্‌তে হবে যে, সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন করাও চাই। যে দীক্ষা আজ ভগবৎ-কৃপায় পেলে, প্রাণ গেলেও তার সাধন পরিত্যাগ কর্ব্বে না, এই জিদ্ থাকা চাই। তবেই দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে।

সুন্দর হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মহামন্ত্র জগতের সকল বস্তুকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে। তোমরা যে আজ মহামন্ত্র পেয়েছ। তোমরাও তোমাদের অজানা-তেই আগের চেয়ে শতগুণে সুন্দর হয়েছ। যোগীর চক্ষু তোমাদের দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে যে, তোমাদের কাণে অখণ্ডনাম প্রবেশ করেছে। মহামন্ত্রের অপর নাম 'সুন্দর'। এ নামটী তার কেন হ'ল জান? অপরকে সে সুন্দর করে। যে তার সাধন করে, চখে, মুখে, দেহে, মনে,

চলায়, বলায় তার অপার সৌন্দর্য্য, অপার সুষমা, অপার লাবণ্য উপ্‌চে পড়ে। পরমসুন্দর নাম পেয়েছ, এই নামের সেবা ক'রে সবাই তোমরা অপরূপ সুন্দর হও।

বিরোধ ভুলিয়া যাও

অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় মহিমচন্দ্র এম-ই স্কুলের প্রাঙ্গনে ধর্ম্মসভা হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বিপুল জনতার সমাবেশ হইয়াছে। আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা এবং শ্রীযুক্ত ভক্তদাদার বক্তৃতা হইবার পরে স্থানীয় দুই একজন বক্তাও কিছু কিছু বলিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠে সুললিত বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টাকাল বলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ নিজ নিজ বিরোধ-বিদ্বেষ ভুলে যাও। সবাই নিজেদিগকে একই পরমপিতার সন্তান ব'লে জানো। বিরোধ-বিদ্বেষ অজ্ঞানতার ফল। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আপন জেনে সকল অজ্ঞানতা দূর কর। ভগবান্‌কে ভালবাসার ভিতর দিয়ে তোমাদের সকল অন্ধতা, সকল মূর্খতা, সকল সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হোক। সমস্বরে এই ঘোষণা-বাণী উচ্চারণের সামর্থ্য অর্জ্জন কর যে, জগতে সবাই এক।

(শান্তির বারতা প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)।

শান্তির বারতা

প্রথম খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক